

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

মুনীর চৌধুরী

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

সম্পাদনা

ইব্রাহীম খলিল

ডষ্টর কাজী দীন মুহম্মদ

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্মর্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে পাঠ্যপুস্তকটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জিন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল-উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা থাকা আবশ্যিক। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলা ভাষার ধারণশক্তি ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর যুগোপযোগী, ভাবোপযোগী ও বিষয়োপযোগী শুন্দর প্রয়োগ করতে হবে; সেজন্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধিত ও পরিমার্জিত ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ নথীন ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এ প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নয়না প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	ভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচেদ	বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	ধ্বনিতত্ত্ব	১৩
দ্বিতীয় পরিচেদ	ধ্বনির পরিবর্তন	২৭
তৃতীয় পরিচেদ	ণ-ত্ত্ব ও ষ-ত্ত্ব বিধান	৩১
চতুর্থ পরিচেদ	সঙ্গি	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৪৫
দ্বিতীয় পরিচেদ	দ্বিবৃক্ত শব্দ	৪৯
তৃতীয় পরিচেদ	সংখ্যাবাচক শব্দ	৫৩
চতুর্থ পরিচেদ	বচন	৫৬
পঞ্চম পরিচেদ	পদাশ্রিত নির্দেশক	৫৯
ষষ্ঠ পরিচেদ	সমাস	৬১
সপ্তম পরিচেদ	উপসর্গ	৭২
অষ্টম পরিচেদ	ধাতু	৭৯
নবম পরিচেদ	কৃৎ-প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা	৮৩
দশম পরিচেদ	তদ্বিতীয় প্রত্যয়	৮৮
একাদশ পরিচেদ	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	পদ-প্রকরণ	৯৭
দ্বিতীয় পরিচেদ	ক্রিয়াপদ	১১২
তৃতীয় পরিচেদ	কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	১১৯
চতুর্থ পরিচেদ	সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ	১২৫
পঞ্চম পরিচেদ	বাংলা অনুজ্ঞা	১৩২
ষষ্ঠ পরিচেদ	ক্রিয়া-বিভক্তি : সাধু ও চলিত	১৩৬
সপ্তম পরিচেদ	কারক ও বিভক্তি এবং সমন্বন্ধ পদ ও সমোধন পদ	১৪৭
অষ্টম পরিচেদ	অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	১৫৯
পঞ্চম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেদ	বাক্য প্রকরণ	১৬৩
দ্বিতীয় পরিচেদ	শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগ্ধারা	১৭৭
তৃতীয় পরিচেদ	বাচ এবং বাচ পরিবর্তন	
চতুর্থ পরিচেদ	উক্তি পরিবর্তন	
পঞ্চম পরিচেদ	যতি বা ছেদ-চিহ্নের লিখন কৌশল	
ষষ্ঠ পরিচেদ	বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	
সপ্তম পরিচেদ	বাক্যে পদ-সংস্থাপনার ক্রম	

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচেদ

ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা

মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কষ্টখনি এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঞ্জিত করে থাকে। কষ্টখনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। আর কষ্টখনির সহায়তায় মানুষ মনের সুস্থাতিসূচু ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কষ্টখনি বলতে মুখগহর, কষ্ট, নাক ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধ্বনিই ভাষার মূল উপাদান। এই ধ্বনির সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্যস্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কষ্ট, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদি বাক্ প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগ্যস্ত্র। এই বাগ্যস্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

সকল মানুষের ভাষাই বাগ্যস্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের কষ্টনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগ্যস্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা।

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে, এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরিয়া ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

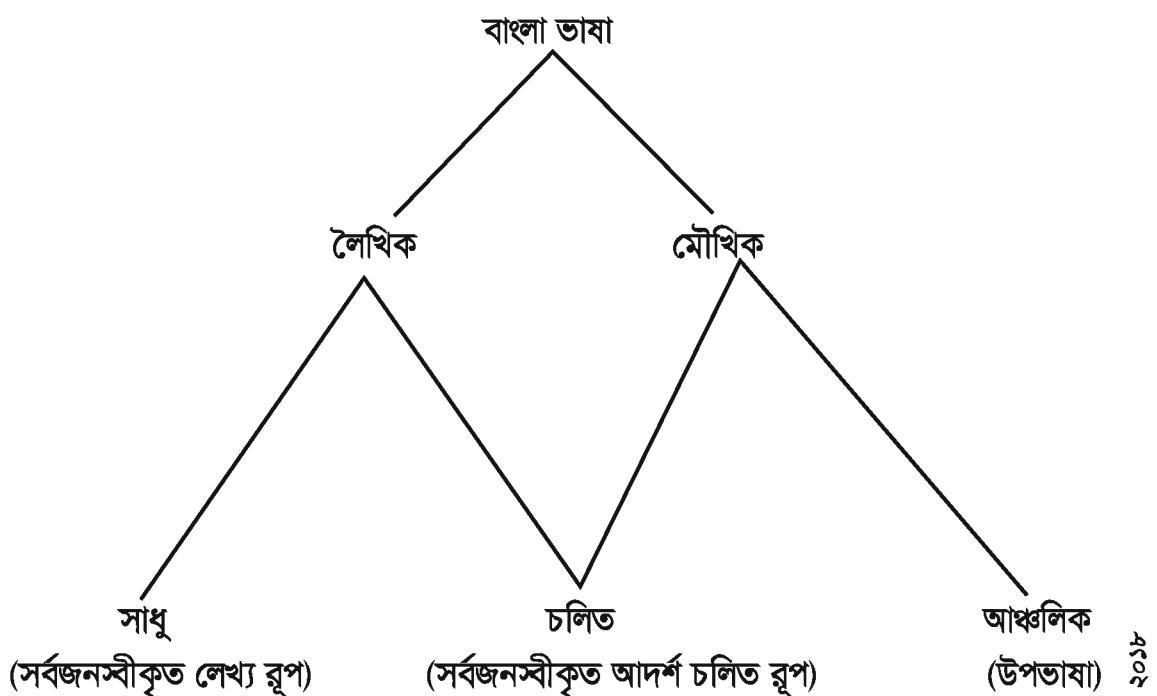
বাংলা ভাষারীতি

কথ্য, চলিত ও সাধু রীতি

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষাই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অস্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পদ্ধতিসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলোপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়



সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

১. সাধু রীতি

- (ক) বাংলা সেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- (খ) এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
- (গ) সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।
- (ঘ) এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।

২. চলিত রীতি

- (ক) চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
- (খ) এ রীতি তঙ্গব শব্দবহুল।
- (গ) চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
- (ঘ) সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক কথ্য রীতি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাংলা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু, চলিত ও কথ্য রীতির উদাহরণ

ক. সাধু রীতি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত লিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহারা আটটার পুর্বেই ডাক-বাংলায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনি যে! আপনার নাম তে হেডমাস্টার লিস্টে দেন নাই।

—কাজী ইমদাদুল হক

খ. চলিত রীতি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে শাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাখালতার ফুল ফুটে রয়েছে।

—বিভূতিভূমণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরের ‘ক’ ও ‘খ’ অনুচ্ছেদ দুটির ভাষার উপাদানে সাধু ও চলিত নীতির পার্থক্য নিচে দেখানো হলো—

<u>পদ</u>	<u>সাধু</u>	<u>চলিত</u>
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো
বিশেষ্য	তুলা	তুগো
বিশেষণ	শুষক/শুকনা	শুকনো
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/উহারা	তাঁরা/ওরা
সর্বনাম	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে
সর্বনাম	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার	করবার/করার
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	হইলেন	হলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	হইল	হল/হলো
ক্রিয়া	দেখিয়া	দেখে
ক্রিয়া	করিলেন	করলেন
ক্রিয়া	দেন নাই	দেননি
ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
ক্রিয়া	পড়িল	পড়ুল/পড়ুলো
ক্রিয়া	করিয়া	করে
ক্রিয়া	ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙ্গে যেতে লাগল
ক্রিয়া	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অব্যয়	সহিত	সঙ্গে/সাথে।

বাংলা ভাষার শব্দ ভাড়ার

বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দ-সম্পর্ক বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পতনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষা ঐ সব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্পর্কের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পদ্ধিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন –

১. তৎসম শব্দ

২. তৎব শব্দ

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব্দ

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+ সম (সমান)]=তার সমান অর্থাত সংস্কৃত। উদাহরণ : চন্দ, সূর্য, নক্ষত্র, তবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

২. তৎব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎব শব্দ। তৎব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, ‘তৎ’ (তার) থেকে ‘ব’ (উৎপন্ন)। যেমন – সংস্কৃত-হস্ত, প্রাকৃত-হথ, তৎব-হাত। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চম্পাকার, তৎব-চামার ইত্যাদি। এই তৎব শব্দগুলোকে খাটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত। উদাহরণ : জ্যোত্ত্বনা, ছেরাদ, গিন্তী, বোষ্টম, কুচ্ছিত- এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোত্ত্বনা, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কৃৎসিত শব্দ থেকে আগত।

৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুঠো প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রাখিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন—কুড়ি (বিশ)-কোলভাষা, পেট (উদৱ)-তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)—মুঠোভাষী ভাষা। এরূপ-কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপুর, ডাব, ডাগুর, টেকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি— এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরআনি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জালাত, জাহানাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুস্কেফ, মোস্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বাদ্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
- (৩) বিবিধ শব্দ : আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়—

- (১) অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে : ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নডেল, নোট, পাউডার, পেঙ্গল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।
- (২) পরিবর্তিত উচ্চারণে : আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইংরোপীয় ভাষার শব্দ

- (১) পর্টুগিজ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাণ্ডি, বালতি ইত্যাদি।
- (২) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।
- (৩) ওল্ডসাজ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুর্প, বুইতন, হরতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

- (১) গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।
- (২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
- (৩) তুর্কি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
- (৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।
- (৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুঞ্জি, লুঞ্জি ইত্যাদি।
- (৬) জাপানি : রিঙ্গা, হারিকিরি ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দবৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম) খ্রিস্টোফ (ইংরেজি+তৎসম), ডাঙ্কার-খানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা), চৌ-হন্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

উদাহরণ : অক্সিজান-oxygen; উদ্যান-hydrogen; নথি-file; প্রশিক্ষণ-training; ব্যবস্থাপক-manager; বেতার-radio; মহাব্যবস্থাপক-general manager; সচিব-secretary; স্নাতক-graduate; স্নাতকোত্তর-post graduate; সমাপ্তি-final; সাময়িকী-periodical; সমীকরণ-equation ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য : বাংলা ভাষার শব্দসম্পদের দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত- যে ভাষা থেকেই আসুক না কেন, এখন তা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। এগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বাংলা থেকে আলাদা করে এদের কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন-টেলিফোন, টেলিফাফ, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রচলিত শব্দের কঠিনতর বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি নিষ্পত্তিযোজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (= বি + আ + কৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশেষভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সুস্থুর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুন্ধাশুন্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুস্থুর প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন—

১. ধ্বনি (Sound)
২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence)
৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয় —

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ((Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অতিধানতত্ত্ব (Lexicography) ছব্দ ও অন্তর্কার প্রভৃতি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি : মানুষের বাক প্রত্যঙ্গা অর্থাৎ কঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ‘ধ্বনি’ বলা হয়। বাক প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

বর্ণ : বাক প্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন—বাংলায় ‘বক’ কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে ‘ব’, ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি); আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় ‘ب’ (বে)।

ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সম্মিশ্রণ, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, গত্ত ও ষত্ত বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে স্ট্যট অর্থবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য (Sentence)। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন—মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পঞ্জিতেরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রাতিপদিক : বিভিন্নিল নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন— হাত, বই, কলম ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই সাধিত শব্দ বলে। যথা— হাতা, গরমিল, দম্পতি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার : নাম শব্দ ও ক্রিয়া। প্রত্যেকটি বা নামশব্দের ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

প্রকৃতি : যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে তাগ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি দুই প্রকার : নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি : হাতল, ফুলেল, মুখর— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই – হাত + ল = হাতল (বাঁট), ফুল + লেল = ফুলেল (ফুলজাত) এবং মুখ + র = মুখর (বাচাল)। এখানে হাত, ফুল ও মুখ শব্দগুলোকে বলা হয় প্রকৃতি বা মূল অংশ। এগুলোর নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : আবার চলন্ত, জমা ও লিখিত— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই $\sqrt{\text{চল}} + \text{অন্ত} = \text{চলন্ত}$ (চলমান), $\sqrt{\text{জম}} + \text{আ} = \text{জমা}$ (সঞ্চিত) এবং $\sqrt{\text{লিখ}} + \text{ইত} = \text{লিখিত}$ (যা লেখা হয়েছে)। এখানে চল, জম ও লিখ— এ তিনটি ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ। এগুলোকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

প্রত্যয় : শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে।
কয়েকটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
হাত	+ ল	হাতল
ফুল	+ এল	ফুলেল
মুখ	+ র	মুখর
ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
$\sqrt{\text{চল}}$	+ অন্ত	চলন্ত
$\sqrt{\text{জম}}$	+ আ	জমা

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায় : ১. তদ্বিত প্রত্যয় ও ২. কৃৎ প্রত্যয়।

১. তদ্বিত প্রত্যয় : শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে তদ্বিত প্রত্যয়। যেমন—হাতল, ফুলেল ও মুখর শব্দের যথাক্রমে ল, এল এবং র তদ্বিত প্রত্যয়।

২. কৃৎ প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। উদাহরণে চলন্ত, জমা ও লিখিত শব্দের যথাক্রমে অন্ত, আ এবং ইত কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্বিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্বিতান্ত শব্দ এবং কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদ্বন্ত শব্দ।
যেমন— হাতল, ফুলেল ও মুখর তদ্বিতান্ত শব্দ এবং চলন্ত, জমা ও লিখিত কৃদ্বন্ত শব্দ।

উপসর্গ : শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকেচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন— ‘পরা’ একটি উপসর্গ, এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ‘জয়’ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে হলো ‘পরাজয়’। এটি জয়ের বিপরীতার্থক। সেইরূপ ‘দর্শন’ অর্থ দেখা। এর আগে ‘প্র’ উপসর্গ যুক্ত হয়ে হলো ‘প্রদর্শন’ অর্থাৎ সম্যকরূপে দর্শন বা বিশেষভাবে দেখা।

বাংলা ভাষায় তিনি প্রকারের উপসর্গ দেখা যায় : ১. সংস্কৃত ২. বাংলা ৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. সংস্কৃত উপসর্গ : প্র, পরা, অপ—এরূপ বিশাটি সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ রয়েছে।

তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘পূর্ণ’ একটি তৎসম শব্দ। ‘পরি’ উপসর্গযোগে হয় ‘পরিপূর্ণ। $\sqrt{হ}$ (হর) + ঘঞ্চ = ‘হার’—এ কৃদত্ত শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে কীরূপ অর্থের পরিবর্তন হলো লক্ষ কর : আ+হার = আহার (খাওয়া), বি + হার = বিহার (অমণ), উপ+হার=উপহার (পারিতোষিক), পরি+হার=পরিহার (বর্জন) ইত্যাদি।

২। বাংলা উপসর্গ : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ বাংলা উপসর্গ। খাটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন – অ+কাজ=অকাজ, অনা+ছিষ্টি (সৃষ্টি শব্দজাত) = অনাছিষ্টি ইত্যাদি।

৩। বিদেশি উপসর্গ : কিছু বিদেশি শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা উপসর্গসমূহে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা : বেহেড, লাপান্তা, গরহাজির ইত্যাদি।

(পরে উপসর্গ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় দারা, দিয়া, কৰ্তৃক, চেয়ে, থেকে, উপরে, পরে, প্রতি, মাঝে, বই, ব্যতীত, অবধি, হেতু, জন্য, কারণ, মতো, তবে ইত্যাদি শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদবূপে বাকেয় ব্যবহৃত হয়; আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে অনুসর্গ বলা হয়। যেমন—কেবল আমার জন্য তোমার এ দুর্ভোগ। মনোযোগ দিয়ে শোন, শেষ পর্যন্ত সবার কাজে আসবে।

অনুশীলনী

- ১। ভাষা বলতে কী বোঝা? বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়টি গুচ্ছ বিভক্ত করা যায়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ৩। নিচের শব্দগুলোকে গুচ্ছ অনুযায়ী সাজাও (তৎসম, তৎব ইত্যাদি শিরোনামের নিচে লেখ)।
রাখাল, স্বাট, বাদশাহ, বেগম, গুরু, গৃহ, হাকিম, দা, হাসপাতাল, চেয়ার, সমুদ্র, কিতাব, ডিজিত, টেকি, চিনি, লুঙ্গি, রিস্বা, দেবতা, খড়ম।
- ৪। ব্যাকরণ কাকে বলে। ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয়?
- ৫। নিচের বাক্যগুলোকে আদর্শ চলিত রীতিতে পরিবর্তন কর।
 - ক. এখনও সে স্কুল হইতে ফিরে নাই।
 - খ. আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি।
 - গ. সে আসিবে বলিয়া ভরসা করিতে পরিতেছি না।
 - ঘ. আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লইয়াছি।
 - ঙ. স্কুল পালাইয়া রবীন্দ্রনাথ হইতে পারিবে না।
 - চ. বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি অঞ্জন হইয়া পড়িলেন।

ছ. সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না, দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না।

জ. যাহাদের কথামতো অঘসর হইলাম শেষ পর্যন্ত তাহারাই আমাকে বিপদে ফেলিল।

ঝ. দুই বন্ধু বনে ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় এক ভালুক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইল।

৬। ঠিকতে টিক () চিহ্ন দাও।

ক. বাংলা লেখ্য ভাষার রীতি কয়টি? – একটি/ দুটি/তিনটি/চারটি

খ. সাধু রীতির বাক্যবিন্যাস–অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট

গ. চলিত রীতি–দুর্বোধ্য/সহজবোধ্য/বক্তৃতার অনুপযোগী

ঘ. বাংলা ভাষার শব্দসম্মানকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? – তিন ভাগে/ পাঁচ ভাগে/ চার ভাগে

ঙ. দেশি শব্দ–সংস্কৃত জাত, তত্ত্বব জাত, দেশজ

চ. তৎসম শব্দ মানে– সংস্কৃত, ফারাসি, উর্দু

৭। ক. নিচের শব্দগুলো থেকে ইংরেজি শব্দ খুঁজে বের কর।

কিতাব, হাকিম, আনারস, চাকর, পেপিল, কলম, চিন, স্কুল, শার্ট

খ. নিচের শব্দগুলো থেকে আরবি–ফারাসি শব্দ খুঁজে বের কর এবং আরবি শব্দের ডানে ‘আ’ ও ফারাসি শব্দের ডানে ‘ফা’ লিখে দাও।

রেস্তোরাঁ, বোতাম, দারোগা, অফিস, আদালত, কলম, দোয়াত, খোদা, নামাজ, নবি, পয়গম্বর, ফুটবল, গুদাম, বালতি, ফেরেশতা, বেহেশত, ইমান, গোসল, মন্তব, মাওলানা।

গ. নিচের শব্দগুলোর প্রতি গুচ্ছের পাশে ডান দিকে যে নাম লেখা আছে তা ভুল হলে ঠিক নামটি বসাও।

১. গুলাহ, ফেরেশতা, দোজখ, রোজা–আরবি

২. মাস্টার, লাইব্রেরি, ব্যাগ, কলেজ–ফারাসি

৩. চন্দ, সূর্য, পত্র, ধর্ম – পর্তুগিজ

৪. চুলা, কুলা, চোজ্জা, ডিঙ্গি–ইংরেজি

৫. হাত, চামার, কামার, মাথা – দেশি

৬. আলপিন, আলমারি, পাউরুটি, চাবি–তৎসম

৭. চাকু, চাকর, দারোগা, তোপ–তত্ত্ব

৮. আল্লাহ, ইসলাম, তসবি, উকিল–তুর্কি।

৮। নিচে ব্যাকরণের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো। যেটি ঠিক তার বাম পাশে টিক () চিহ্ন দাও।

১. যে শাস্ত্রে ভাষার বিভিন্ন উপাদান, তার গঠনপ্রকৃতি ও তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।

২. যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুন্ধরূপে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন - অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। যেমন- ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন - অ, আ, ই, উ, উ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন- ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সূবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন - ক + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে ‘হস্ত’ বা ‘হল’ চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচালিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঊ ঔ ঔ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

ট ঠ চ চ ণ	৫টি
ত থ দ ধ ন	৫টি
প ফ ব ত ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড় ঢ য ঃ	৪টি
ঁ :	৩টি

মোট ৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ – এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন – অ + ই = ঐ , অ + উ = ঔ

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ঔ, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত – যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা ‘কার’। যেমন – ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (।)। ‘ম’-এর সঙ্গে ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘।’ যুক্ত হয়ে হয় ‘মা’। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন – আ-কার (।), ই-কার (ঁ), ঈ-কার (ঁ), উ-কার (ু), ঊ-কার (ু), ঝ-কার (ঝ), এ-কার (ং), ঐ-কার (ঈ), ঔ-কার (ঔ), ঔ-কার (ঔ-ঁ)। অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা ‘কার’ নেই।

আ-কার (।) এবং ঈ-কার (ঁ) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ঁ), এ-কার (ং) এবং ঐ-কার (ঈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঊ-কার (ু) এবং ঝ-কার (ঝ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (ঔ-ঁ) এবং ঔ-কার (ঔ-ঁ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মৌ, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন-ম্য, ম্ব ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন ‘কার’ বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ‘ফলা’। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন– ম-এ য-ফলা = ম্য, ম- এ র-ফলা = ম্ব, ম-এ ল- ফলা = ম্ব, ম-এ ব-ফলা = ম্ব। র-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। ‘ম্ব’; আবার ‘র’ যদি ম-এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন-

ম-এ রেফ ‘র্ম’ তবে লেখা হয় শপরে, ব্যঙ্গনটির মাথায় রেফ (‘) দিয়ে। ‘ফলা’ যুক্ত হলে যেমন, তেমনি ‘কার’ যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন – হ-এ উ-কার=হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ-কার = শু, স-এ উ-কার=সু, র-এ উ-কার = রু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঝ-কার=হু।

কথেকে ম পর্যন্ত পীচশটি স্পর্শধ্বনি (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্ণীয় ধ্বনি। বর্ণভূক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও ঐ বর্ণীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন-

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে এগুলো	কঠ্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে ‘ক’	বর্ণীয়	বর্ণ
চ ছ জ ব এও	”	”	তালব্য	”	”	”	‘চ’	”
ট ঠ ড ঢ ণ	”	”	মুর্ধন্য	”	”	”	‘ট’	”
ত থ দ ধ ন	”	”	দস্ত্য	”	”	”	‘ত’	”
প ফ ব ত ম	”	”	ওষ্ঠ্য	”	”	”	‘প’	”

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঙ্গনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কঠ্য বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাত দস্তমূল, দস্ত বা অগ্র দস্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঙ্গনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত, ৩. মুর্ধন্য বা পশ্চাত দস্তমূলীয়, ৪. দস্ত্য বা অগ্র দস্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ্য।

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গ গুলো ব্যবহৃত হয় :

- ১ - ঠেঁট (ওষ্ঠ ও অধর)
- ২ - দাঁতের পাটি
- ৩ - দস্তমূল, অগ্র দস্তমূল
- ৪ - অগ্রতালু, শক্ত তালু
- ৫ - পশ্চাতালু, নরম তালু, মূর্ধা
- ৬ - আলজিভ
- ৭ - জিহবাথ
- ৮ - সম্মুখ জিহবা
- ৯ - পশ্চাদজিহবা, জিহবামূল
- ১০ - নাসা-গহৰ
- ১১ - স্বর-পল্লব, স্বরতন্ত্রী
- ১২ - ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহবামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কঞ্চ বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ শ য ষ	তালব্য বর্ণ
পশ্চাত দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাত দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খঙ্গ-ত (ঁ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি ‘ত’ বর্ণের হস্ত-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র।

ঁ : ^ – এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রমী বর্ণ।

ঙ ওঁ ণ ন ম-এ পাঁচটি বর্ণ এবং ঁ ষ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃস্ত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

স্বরধ্বনির ত্রুটা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে ত্রুট বা দীর্ঘ হয়। যেমন- ইঁরেজি full-পূর্ণ এবং fool বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ ত্রুট ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। ত্রুট বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে ত্রুট হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন-ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন-লিখিত হয়েছে ত্রুট ই-কার ও ত্রুট - উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, দ্বন্দ্ব ফিরু, ভূমি-লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ই-কার এবং দীর্ঘ উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে ত্রুট হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন-দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন-অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

ব্যঙ্গনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

আগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্ফূর্তি ধ্বনিজ্ঞাপক। কথেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি ব্যঙ্গনকে সর্ব ব্যঙ্গন বা স্ফূর্তি ব্যঙ্গনধ্বনি বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্ব ব্যঙ্গনধ্বনিগুলোকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. অঘোষ এবং ২. ঘোষ।

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন— ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন— গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

ক. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অঞ্চলপ্রাণ ধ্বনি। যেমন— ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

খ. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন— খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

উম্বুধ্বনি : শ, ষ, স, হ — এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উম্বুধ্বনি বা শিশধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উম্বুবর্ণ।

শ ষ স — এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অঞ্চলপ্রাণ, আর ‘হ’ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য (Y) এবং ব (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান সর্ব ও উম্বুধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি।

ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং ঈ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে। এ ধ্বনির উচ্চারণে জিহবার অবস্থান ঈ—ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ—ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। ই ঈ এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় সম্মুখ ধ্বনি। ই এবং ঈ—র উচ্চারণের বেলায় জিহবা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি। এ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং আ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।

উ এবং উ—ধ্বনি উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাত তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা আরও একটু নিচে আসে। অ—ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। উ উ ও অ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে পশ্চাত স্বরধ্বনি বলা হয়। উ উ—ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহবা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাত স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাত স্বরধ্বনি এবং অ—নিম্নাবস্থিত পশ্চাত স্বরধ্বনি।

বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সমুখ ও পশ্চাত অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সমুখ, উষ্ঠাধর প্রস্তুত	কেন্দ্রীয়, উষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাত, উষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ উ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে লিখিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন—অমর, অনেক।

২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন— কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক + অ + র + অ; ব+ অ + ল + অ)।

শব্দের অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন— অমল, অনেক, কত।

২. সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা— অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।

১. ‘অ’-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

(ক) শব্দের আদিতে

১. শব্দের আদিতে না-বোধক ‘অ’ যেমন — অটল, অনাচার।

২. ‘অ’ কিংবা ‘আ’-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন — অমানিশা, কথা।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসজ্ঞাতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন — কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।

২. ঝ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং উ-ধ্বনির পরবর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন — তৃণ, দেব, ধৈর্য, নোঙক, মৌন ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন — গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

২. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। ঠোট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোট গোলাকৃত হয়ে ‘ও’-এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে ‘বিকৃত’, ‘অপ্রকৃত’ বা ‘অস্বাভাবিক’ উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও ‘স্বাভাবিক’, ‘অবিকৃত’ ও ‘প্রকৃত’ উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা ‘কোরে’)। কিন্তু সমাপিকা ‘করে’ শব্দের ‘অ’ বিবৃত।
২. পরবর্তী ই, উ – ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র-ফলাযুক্ত ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু আ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন—প্রভাত, প্রত্যয়, প্রগাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।
২. ই, উ-এর পরবর্তী মধ্যে ও অন্ত্য ‘অ’ সংবৃত। যেমন – পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

আ : বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ ত্রুট্য ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)-এর মতো। যেমন— আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বাংলায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন— কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ ত্রুট্য। এরূপ— যা, পান, ধান, সাজ, চাল, টাঁদ, বাঁশ।

ই ঈ : বাংলায় সাধারণত ত্রুট্য ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ – দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন— বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।

উ উ : বাংলায় উ এবং উ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ-ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের বদ্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন— চুল (দীর্ঘ), চুলা (ত্রুট্য), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ।

ঝ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঝ-এর উচ্চারণ রি অথবা রী-এর মতো হয়। আর ব্যঙ্গন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা+ ই-কার এর মতো হয়। যেমন— ঝণ, ঝাতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্ণি (ক্রিষ্ণি)।

ঝঁঁট্য : বাংলায় ঝঁ-ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিয়ুপে উচ্চারিত হয়।

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রাখিত হয়েছে।

এ : এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা-(খ্যালা), বিবৃত।

১. সংবৃত

ক) পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঙ্গনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন— দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— কে, সে, যে।

ঘ) ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— দেহ, কেহ, কেহে।

ঙ) ‘ই’ বা ‘উ’-কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন – দেখি, রেণু, বেলুন।

২. বিবৃত : ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর ‘এ’ (a)-এর মতো। যেমন— দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।

এ-ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে— যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম— যেথা, সেথা, হেথা।

খ) অনুস্বার ও চন্দ্ৰবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন— খেঢ়ো, চেঢ়ো, সঁ্যাতসেঁতে, গৌঝেল।

গ) খাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন— খেমটা, টেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঘ) এক, এগার, তের — এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, ‘এক’ যুক্ত শব্দেও : যেমন— একচোট, একতলা, একথরে ইত্যাদি।

ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের ঝুঁপে; যেমন— দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ও + ই = অই, ওই। অ এবং ই- এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন – ক + অ + ই = কই, কৈ; ব + ই + থ = বৈথ ইত্যাদি। এরূপ – বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন— গো, জোর, রোগ, ডোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত ত্রুট্য হয়। যেমন— সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ব্যঙ্গনথবনির উচ্চারণ

ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাত ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কর্ষ্য স্পর্শধ্বনি।

চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ ঝ ঞ—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

ট-বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎও উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দস্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।

ত-বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দস্ত্য ধ্বনি।

প-বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ত ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে উল্টের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের উল্ট্যধ্বনি বলে।

জ্ঞাতব্য

(১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগমন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা উল্টের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে স্পর্শ ধ্বনি।

(২) ঙ ঞ ঞ ন ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।

(৩) * চন্দ্ৰবিদ্যু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক ধ্বনি এবং প্রতীকটিকে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ বলে। যেমন— আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।

(৪) বাঞ্ছায় ঙ এবং ৎ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন—ৱঙ / ৱৎ, অহংকার / অহঞ্জকার ইত্যাদি।

(৫) এও বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা ‘ইয়’—এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন— ভূঁঞ্চা (ভুঁইয়া)।

(৬) চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে এও—এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন— জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।

(৭) বাঞ্ছায় ৎ এবং ন-বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ৎ—এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন— ঘণ্টা, লঞ্চ ইত্যাদি।

- (৮) ঙ ৎ এ – এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন— সঞ্জ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঁঝা, ক্ষণ ইত্যাদি।
- (৯) ন–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন— নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন— ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন— খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গান্ধীর্ঘহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন— ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন— গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো—

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঝঁ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাত মাঝে আছে বলে য র ল ব-এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

য : য-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাঞ্ছায় এর উচ্চারণ ‘জ’-এর মতো। যেমন – যথন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘য’ উচ্চারিত হয়। যেমন – বি + যোগ = বিয়োগ।

র : র-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগৃহকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজ্ঞাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ – রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ল : ল-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন – লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ব : বাঞ্ছা বর্ণমালায় বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব-এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ- এ দুই রকমের ব-এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ-ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃস্থ ‘য’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’- এ দুটো অর্ধব্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মতো। যেমন – নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : যে ব্যঙ্গনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি উষ্মধ্বনি। যেমন– আশীষ, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে শিশধ্বনিও বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উষ্ম বর্ণ। শ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাত দন্তমূল। ষ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স-এর সঙ্গে খ র ত থ কিংবা ন যুক্ত হলে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন – স্থলন, স্থফ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য-স হয়। যেমন – শ্রমিক (স্বমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রন)।

অঘোষ অঘ্রপাণ ও অঘোষ মহাপাণ মূর্ধন্যধ্বনি(ট ও ঠ)-এর আগে এলে স-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন– কষ্ট, কাষ্ট ইত্যাদি।

হ : হ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। এ উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্নত কঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন – হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ঁ (অনুস্বার) : ঁ এর উচ্চারণ ঙ-এর উচ্চারণের মতো। যেমন – রঁ (রঙ), বাঞ্ছা (বাঞ্ছলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ঁ-এর বদলে ঙ এবং ঙ-এর বদলে ঁ-এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

ঋ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অধোষ ‘হ’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঋ এর উচ্চারণ অধোষ। বাংলায় একমাত্র বিম্বযাদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা— আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্ছারিত থাকে। যেমন— বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে প্রবর্তী ব্যঙ্গন দ্বিতৃ হয়। যেমন— দুঃখ (দুখখ), প্রাতঃকাল (প্রাতককাল)।

ডঃ ও ঢঃ : ডঃ ও ঢঃ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্ধাং উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দস্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্ছারিত হয়। এদের বলা হয় তাড়নজ্ঞাত ধ্বনি। ডঃ-এর উচ্চারণ ড এবং র-এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢঃ-এর উচ্চারণ ডঃ এবং হ-এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন— বড়, গাঢ়, রাঢ়, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঙ্গনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঙ্গনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঙ্গনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্ছারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঙ্গনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঙ্গনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন— তক্তা (ত + অ + ক + ত + আ = তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঙ্গন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে ব্যঙ্গনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে : স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে ‘কার’। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ-কার (।) — বাবা, মা, চাকা; খ-কার (ঁ) কৃতী, গৃহ, স্তৃত;

ই-কার (ঁ) — পাখি, বাড়ি, চিনি; এ-কার (ং) ছেলে, মেয়ে, ধেয়ে;

ঈ-কার (ী) — নীতি, শীত, স্ত্রী; ঐ-কার (ঈ) বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;

উ-কার (ু) — খুকু, বুবু, ফুফু; ঔ-কার (ঁ) দোলা, তোতা, খোকা;

উ-কার (ু) — মূল্য, চুর্ণ, পূজা; উ-কার (ঁ) পৌষ, পৌত্র, কৌতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঙ্গনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন—

ণ/ ন-ফলা (ণ/ ন/)- চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাঙ্গ, অপরাঙ্গ, বিষু, কৃষ্ণ। চিহ্ন-র । এবং কৃষ্ণ-র ৩

ব- ফলা (ব)- বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ম- ফলা (ম)- তন্মায়, পদ্ম, আআ।

য- ফলা (ঝ) - সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা।

র- ফলা (ৰ)- গ্রহ, ব্রত, স্মর্ষ।

(‘রেফ) - বর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, খর্ব।

ল- ফলা (ল)- ক্লান্ত, অপ্লান, উল্লাস।

থ. ২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা- এ্যাপোলো, এ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।

থ. ৩. বাংলা যুক্ত ব্যঙ্গনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন - সন্ধ্যাস, সূক্ষ্ম, বুঞ্জিপী, সম্ম্যা, ইত্যাদি।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঙ্গন বর্ণ।

দুই বর্ণের যুক্ত:

ক = ক+ক। যেমন- পাকা, ছকা, চক্র।

ক্ত = ক+ত। যেমন- রক্ত, শক্ত, তক্ত।

ক্ষ= ক+ষ। (উচ্চারণ ক+খ-এর মতো) যেমন- শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা।

অ= ক+স। বাক্স।

ঙক= ঙ+ক। যেমন- অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা।

ঙখ= ঙ+খ। যেমন- শৃঙ্খলা, শঙ্খ।

ঙ্গ= ঙ+গ। যেমন- অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত।

ঙ্ঘ= ঙ+ঘ। যেমন- সঙ্ঘ, লঙ্ঘন।

চ= চ +চ। যেমন- উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত।

ছ= চ+ছ। যেমন- উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ।

জ্জ= জ্জ+জ। যেমন- উজ্জীবন, উজ্জীবিত।

ঞ্জ= জ্জ+ঝ। যেমন- কুঞ্জাটিকা।

জ্ঞ= জ্জ +ঝ। যেমন- উচ্চারণ ‘গ্ৰাহ্য’- এর মতো) যেমন- জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান।

ধ্ব (ধও)= এও +চ। যেমন- অধ্বল, সংধ্বয়, পঞ্চম।

ঙ্গ= এও +ছ। যেমন- বাঙ্গিত, বাঙ্গনীয়, বাঙ্গ।

ঙ্গ= এও +জ। যেমন- গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ।

ঞ্জ= এও+ঝ। যেমন- ঝাঙ্গা, ঝাঙ্গাট।

[বি. দ্র. উপর্যুক্ত চারটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ‘ন’ হলে ও লেখার সময় কখনো ন্চ (অন্চল), ন্ছ (বান্ছা), ন্জ (গন্জ), নঝ (ঝন্ঝা) রূপে লেখা ঠিক নয়।]

ট= ট + ট। যেমন- অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ডড= ড + ড। যেমন- গডডালিকা, উডডীন, উডডয়ন।

ঞ্ট= ণ+ট। যেমন- ঘণ্টা, বণ্টন।

ঙ্ট= ত্ত + ত। যেমন- উঙ্টম, বিঙ্ট, চিঙ্ট।

থ= ত্ত+থ। যেমন-উথান, উথিত, অভুথান।

দ্দ= দ্দ + দ। যেমন-উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।

ন্ধ= দ্দ + থ। যেমন- উন্ধত, উন্ধৃত, পন্ধতি।

ঙ্গ= দ্দ + ত। যেমন- উঙ্গব, উঙ্গট, উঙ্গিদ।

ঙ্ক= ন্ন+ত। যেমন- অঙ্ক, দন্ত, কান্ত।

ঙ্ম= ন্ন+দ। যেমন- আনঙ্ম, সম্মেশ, কৰ্মী।

ঙ্খ= ন্ন+খ। যেমন- বন্ধন, রঞ্খন, সম্বান।

ঙ্গ= ন্ন + ন। যেমন- অঙ্গ, ছিঙ্গ, ভিঙ্গ।

ঝ= ন্ন + ম। যেমন- জন্ম, আজন্ম।

প্ত= প্ত + ত। যেমন- রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত।

প্প= প্ত + প। যেমন- পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।

প্স= প্ত + স। যেমন- লিঙ্গা, অভীঙ্গা।

ব্দ= ব্দ + দ। যেমন-অব্দ, জব্দ, শব্দ।

ঙ্ক= ল্ল + ক। যেমন- উঙ্কা, বঙ্কল।

ঙ্গু= ল্ল + গ। যেমন- ফাঙ্গুন।

ঙ্ট= ল্ল + ট। যেমন- উল্টা।

ষ্কক= ষ্ক + ক। যেমন- শুষ্কক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।

ষ্কৰ= ষ্ক + ক। যেমন- স্কুল, স্কুল্য।

ষ্কথ= ষ্ক + থ। যেমন- স্কুলন।

ষ্ট= স+ট। যেমন- আগষ্ট, স্টেশন।

ষ্টত= স + ত। যেমন- অষ্টত, সম্মতা, স্তন্থ।

ষ্প= স + প। যেমন- স্পষ্ট, সম্পদন, স্পর্ধা।

ষ্ফ= স + ফ। যেমন- স্ফটিক, প্রস্ফুটিত।

ঞ্চ= হ্চ + ম। যেমন- ব্ৰহ্ম, ব্ৰাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বৰ্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বৰ্ণ গঠিত হয়। সূক্ষ্ম শব্দে ঞ্চ বৰ্ণ= ক
+ষ+ম- ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের ত্র্য=ন+ত+র-ফলা (৴) +য-ফলা (ঝ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম (Prothesis)। যেমন – স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টেশন। এরূপ – আস্তাবল, আস্পর্ধা।

২. মধ্য স্বরাগম, বিথকর্ব বা স্বরভঙ্গি (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঙ্গন-ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিথকর্ব বা স্বরভঙ্গি। যেমন–

অ – রাত্ত > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই – প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

উ – মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ – গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্ট্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

ও – শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন – দিশ্ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চিং, সত্য > সত্যি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঙ্গনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন – আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সহিত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন – ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসংজ্ঞাতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসংজ্ঞাতি বলে। যেমন – দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মূলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – মূলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

খ. পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদিস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

- গ. মধ্যগত (**Mutual**) : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – বিলাতি > বিলিতি।
- ঘ. অন্যোন্য (**Reciprocal**) : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসংজ্ঞাতি হয়। যেমন – মোজা > মুজো।
- ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসংজ্ঞাতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমন – মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে – উডুনি > উড়ুনি, এখনি > এখুনি হয়।
৭. সম্প্রকৰ্ম বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকৰ্ম। যেমন – বসতি > বস্তি, জানালা > জানুলা ইত্যাদি।
- ক. আদিস্বরলোপ (**Aphesis**) : যেমন – অলাবু > লাবু > লাউ, উন্ধার > উধার > ধার।
- খ. মধ্যস্বর লোপ (**Syncope**) : অগুরু > অগু, সুবর্ণ > বর্ণ।
- গ. অন্ত্যস্বর লোপ (**Apocope**) : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সঞ্চাবা > সঁচা। (স্বরলোপ কম্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)
৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন – ইংরেজি বাক্স > বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুরূপ – পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।
৯. সমীতবন (**Assimilation**) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীতবন। যেমন – জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্দা ইত্যাদি।
- ক. প্রগত (**Progressive**) সমীতবন : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীতবন। যেমন – চক্র > চক্ক, পক্ষ > পক্ক, পদ্ম > লগ্ন ইত্যাদি।
- খ. পরাগত (**Regressive**) সমীতবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীতবন। যেমন – তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।
- গ. অন্যোন্য (**Mutual**) সমীতবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীতবন। যেমন – সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্ঞা ইত্যাদি।
১০. বিষমীতবন (**Dissimilation**) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীতবন বলে। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।
১১. দ্বিতীয় ব্যঞ্জন (**Long Consonant**) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্তা : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্তা। যেমন – পাকা > পাকা, সকাল > সঙ্কাল ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন— কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচূড়তি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচূড়তি বা ব্যঞ্জনচূড়তি। যেমন— বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হৃতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হৃতি। যেমন— ফাল্লুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিশৃতি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশৃতি। যেমন— করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইরা’ থেকে অভিশৃতিজাত ‘করে’। এরূপ— শুনিয়া > শুনে, বশিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিতীয় হয়। যেমন— তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

১৭. হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন— পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ্ > বাহ্লা আল্লা, ফারসি শাহ্ > বাহ্লা শা ইত্যাদি।

য-শৃতি ও ব-শৃতি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ (Y) বা অন্তঃস্থ ‘ব’ (W) উচারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য-শৃতি ও ব-শৃতি। যেমন— মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ— নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাহ্লা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাহ্লা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
ঙ, এঁ, ণ, ন, শ, ষ, স, ৱ, ৢ, ঢ।

- ৫। নিচের শব্দগুলোর ঠিক উচ্চারণ পাশে লিখে দাও।
 দিতীয়, আতীয়, অবজ্ঞা, বিশ্ব, বিজয়, সত্য, সহ্য।
 (নমুনা : ঝঁঝঁ – ঝনবা, কঞ্টক – কণটক)।
- ৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও : সমীভবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, অন্তর্হতি, অপিনিহিতি, অভিশৃতি।
- ৭। ধ্বনি পরিবর্তনের যে যে বিধানে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।
 কপাট, জেলে, বৌদি, আলাদা।
- ৮। বৰ্ণনীর মধ্য থেকে ঠিক সূত্রটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
 (অপিনিহিতি, ধ্বনি-বিপর্যয়, স্বরধ্বনি লোপ, স্বরাগম, অভিশৃতি, স্বরসঙ্গতি, অসমীকরণ, বর্ণদ্বিতা)
 (ক) একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য ‘আ’ যুক্ত হলে তাকে বলে.....।
 (খ) শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।
 (গ) শব্দের মধ্যে দুটি সমধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে বলে.....।
 (ঘ) জোর দেয়ার জন্য যখন শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিতীয় উচ্চারণ হয় তখন তাকে.....বলা হয়।
 (ঙ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকেবলে।
- ৯। নিচের বর্ণে দেয়াতিত ধ্বনির নাম ডান পার্শ্বে লেখ (যেমন – ঘোষ, মহাথ্রাণ, কঠ্য ব্যঞ্জন)।
 ব, শ, ম, দ, খ, প, ঠ, হ, ক্ষ
- ১০। ঠিক উভয়ে টিক (✓) দাও।
 ট – কঠ্যবর্ণ, ম – ওষ্ঠ্যবর্ণ, গ – ঘোষবর্ণ, চ – দন্ত্যবর্ণ, ঘ – অঙ্গপ্রাণ কঠ্যবর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ণতু ও ষত্ব বিধান

১. ণতু বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তঙ্গব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণতু বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ‘ণ’ যুক্ত হয়। যেমন— ঘণ্টা, লঞ্চ, কাণ্ড ইত্যাদি।
২. ঝ, র, ষ – এর পরে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন— ঝণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষণ ইত্যাদি।
৩. ঝ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, ষ য ব হ ই এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন – কৃপণ (ঝ-কারের পরে প্, তার পরে ণ), হরিণ (র-এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্পণ (র + প. + অ+ণ), লক্ষণ (ক + ষ + অ + ণ)। এরূপ – ঝুঁক্ষণী, ত্রাঙ্গণ ইত্যাদি।
৪. কতকগুলো শব্দে স্বত্বাবত্তি ণ হয়

চাগক্য মাণিক্য গণ

বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

কল্যাণ শোণিত মণি

স্থাগু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী

নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।

চিকণ নিকণ তৃণ

কফণি (কনুটি) বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন – ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্বীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিষ্ঠা, অঞ্চনায়ক। ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন – অন্ত, গ্রন্থ, ক্রস্তন।

২. ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তঙ্গব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে ‘ষ’ রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ‘ষ’-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন— ভবিষ্যৎ (ভ + অ + ব + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), মুমুর্শ, চক্ষুঘান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
২. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ‘ষ’ হয়। যেমন— অভিসেক > অভিযেক, সুসৃত > সুষৃত, অনুসংজ্ঞা > অনুষঙ্গা, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
৩. ‘খ’ এবং খ কারের পর ‘ষ’ হয়। যেমন— খষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।
৪. তৎসম শব্দে ‘র’-এর পর ‘ষ’ হয়। যেমন— বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।
৫. র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে ‘ষ’ হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।
৬. ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে ‘ষ’ যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ট, ওষ্ট ইত্যাদি।
৭. কতগুলো শব্দে স্বত্বাবত্তই ‘ষ’ হয়। যেমন— যড়খতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, উষধ, যড়যন্ত্র, ভূষণ, দেষ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

- ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন— জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।
- খ. সংস্কৃত ‘সাং’ প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন— অগ্নিসাং, ধূলিসাং, ভূমিসাং ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। গত্ত বিধান ও ষত্ত বিধান বলতে কী বোঝ ? উদাহরণসহ আলোচনা কর ।
- ২। সমাসবদ্ধ পদে গত্ত বিধানের নিয়ম খাটে না, এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও ।
- ৩। শৃঙ্খলান পূরণ কর :

(ক) ট, ঠ, ড এবং চ বর্ণের পূর্বে ‘ন’ যুক্ত হলে সর্বদাই ন হয় ।

যেমন.....(৫টি)

(খ) অ, আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের দ্রষ্টব্য স মূর্ধন্য ষ হয় ।

যেমন.....(৫টি)

(গ) বিদেশি ও দেশি শব্দের বানানে ষ হয় না ।

যেমন.....(৫টি)

- ৪। নিচের শব্দগুলো শুন্ধ করে লেখ :

লবন, নশ্ট, পুরষ্কার, সুসম, আনুসংজ্ঞিক, ফেশন, পোষাক, জার্মান, ক্রুআণ, দুর্ণাম ।

- ৫। যে বানানটি ঠিক তার নিচে দাগ দাও :

(ক) কৃপণ, তৃন, ঘন্টা, বৰ্ণ, হরিন, লাবণ্য, কনিকা, বণিক, কৃশক, উৎকৃষ্ট, কাঠ, শুশমা, অনুসংজ্ঞা, বিষ, সরিষা, পোষ্ট ।

(খ) আষার / আষাঢ় / আশাড়

পাষাণ / পাষণ্ড, পাসণ্ড

তোষণ / তোশন / তোসণ

প্রতিষ্ঠান / প্রতিষ্ঠাণ / প্রতিষ্ঠান

মিলন / মিলণ

কণিকা / কনিকা

লবণ / লবন

দর্পণ / দর্পণ

কল্যাণ / কল্যান

গুণী / গুনী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন— আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (ই) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (ই) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্য হয়েছে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধ্যুর্য সম্পাদন। যেমন— ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ ‘হিম আলয়’ বলতে যেরূপ শোনা যায়, ‘হিমালয়’ তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শুভিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধ্যুর্য রাঙ্কিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন— কচু + আদা + আলু = কচাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচাদ্বাদা হয় না।

আমরা প্রথমে খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। উল্লেখ্য, তৎসম সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা সন্ধি দুই রকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন—

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন — শত + এক = শতেক। এরূপ – কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন — শাখা + আরি = শাখারি। এরূপ – রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + ট = ট (আ লোপ)। যেমন — মিথ্যা + টক = মিথ্যক। এরূপ – হিংসুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন — কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ – ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।

আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ – নদীর (নদী + এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরাটি লোপ পায়। যেমন — যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই।

এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

২। ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীক্ষণ (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিতীয় হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছোট + দা = ছোড়দা।
২. হলস্ত রং (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে রং লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিতীয় হয়। যেমন– আর্. + না = আন্না, চার + টি = চাটি, ধর্. + না = ধন্না, দুর্. + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।
৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিতীয় হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিতীয় হয়। যেমন– নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ. = জ্জ), বদ্ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাছানি ইত্যাদি।
৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’-এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাশ্চ। সাত + শ = সাশ্চ, পাঁচ + সিকা = পাশ্চিকা।
৫. হলস্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক।
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিনি প্রকার : (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জন সন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ নর+ অথম = নরাথম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথার্থ। এরূপ – আশাতীত, কথামৃত, মহার্থ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + ই = এ শুত + ইচ্ছা = শুতেচ্ছা।

আ + ই = এ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঔ = এ পরম + ঔশ = পরমেশ।

আ + ঔ = এ মহা + ঔশ = মহেশ।

এরূপ—পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও গজা + ঊর্মি = গজোর্মি।

এরূপ—নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঝ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং তা রেফ (‘) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন—

অ + ঝ = ঝর দেব + ঝষি = দেবৰ্ষি।

আ + ঝ = ঝর মহা + ঝষি = মহৰ্ষি।

এরূপ—অধর্মণ, উত্তর্মণ, সম্র্তর্ষি, রাজৰ্ষি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ‘খ্ত’-শব্দ থাকলে (অ, আ+খ্ত) উভয় মিলে ‘আর’ হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন—

অ + খ্ত = আর শীত + খ্ত = শীতার্ত।

আ + খ্ত = আর তৃক্ষণ + খ্ত = তৃক্ষার্ত।

এরূপ—ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক।

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব।

অ + ঔ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য।

আ + ঔ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ—হিতৈষী, সৰ্বৈব, অতুলেশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি।

অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত

ঈ + ঈ = ঈ পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।

ঈ + ঈ = ঈ সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ—গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ডিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে ‘য’ বা য(j) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে লেখা হয়। যেমন—

ই + অ = য + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ই + আ = য + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ই + উ = য + উ অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + উ = য + উ প্রতি + উষ = প্রত্যুষ।

ঈ + আ = য + আ মসী + আধার = মস্যাধার।

ই + এ = য + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + অ = য + অ নদী + অন্ধু = নদ্যান্ধু।

এরূপ—প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অন্ত্যথান, অত্যাচর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে উ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

উ + উ = উ মরু + উদ্যান = মরুদ্যান।

উ + ঊ = ঊ বহু + ঊর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব।

উ + ঊ = ঊ বধু + ঊসব = বধুসব।

উ + ঊ = ঊ ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার ও উ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা উ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-

উ + অ = ব + অ	সু + অঞ্চ = স্বঞ্চ।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অন্বিত।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈ = তন্বী।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অন্বেষণ।

এরূপ- পশ্চিম, পশ্চাচার, অনুয়, মন্ত্রন ইত্যাদি।

১২. ঝ-কারের পর ঝ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ‘ঝ’ স্থানে ‘র’ হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, উ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, উ স্থানে যথাক্রমে অব্র ও আব্র হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।
ও + অ = অব্র + অ	পো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।
উ + অ = আব্র + অ	পৌ + অক = পাবক।
ও + আ = অব্র + আ	গো + আদি = গবাদি।
ও + এ = অব্র + এ	গো + এষণা = গবেষণা।
ও + ই = অব্র + ই	পো + ইত্র = পবিত্র।
উ + ই = আব্র + ই	নৌ + ইক = নাবিক।
উ + উ = আব্র + উ	ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সম্বিধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিন্ধি বলে। যথা - কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + উচ্চ = প্রৌচ্ছ (প্রোচ্ছ নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অঙ্গ = মার্তঙ্গ, শুন্ধ + শুদ্ধন = শুন্ধেদ্ধন।

২. ব্যঞ্জনসম্বিধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সম্বিধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সম্বিধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সম্বিধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়), দ্, ব হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ক + অ = গ	দিক + অন্ত = দিগন্ত।
চ + অ = জ	শিচ + অন্ত = শিঙন্ত।
ট + আ = ড্	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।
প্ + অ = ব	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দিত্ব (ছ) হয়। যথা-

অ + ছ = ছ	এক + ছত্র = একছত্র।
আ + ছ = ছ	কথা + ছলে = কথাছলে।
ই + ছ = ছ	পরি + ছদ = পরিছদ।

এরূপ – মুখছবি, বিছেদ, পরিছেদ, বিছিন্ন, অঞ্চছেদ, আলোকছটা, প্রতিছবি, প্রছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্-এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ	সৎ + চিন্তা = সচিন্তা।
ত্ + ছ = ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = চ	বিপদ + চয় = বিপচয়।
দ্ + ছ = ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ – উচ্চারণ, শরচন্দ্র, সচরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্-এরপর জ্ ও ব্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ্জ	সৎ + জন = সজ্জন।
দ্ + জ = জ্জ	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
ত্ + ব = ব্ব	কুৎ + বটিকা = কুস্বটিকা।

এরূপ – উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩. ত ও দ্-এরপর শ্ থাকলে ত ও দ্-এর স্থলে চ এবং শ্-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন-

$$\text{ত} + \text{শ} = \text{চ} + \� = \ছ \quad \text{উৎ + শ্বাস} = \text{উচ্ছ্বাস}$$

এরূপ - চলচ্ছত্তি, উচ্ছুঙ্গল ইত্যাদি।

৪. ত ও দ্-এর পর ড থাকলে ত ও দ্ এর স্থানে ড হয়। যেমন-

$$\text{ত} + \text{ড} = \text{ড্ত} \quad \text{উৎ + ডীন} = \text{উড্ডীন।}$$

এরূপ - বৃহড়চক্র।

৫. ত ও দ্ এর পর হ থাকলে ত ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ হয়। যেমন-

$$\text{ত} + \text{হ} = \text{দ} + \text{ধ} = \text{দ্ধ} \quad \text{উৎ + হার} = \text{উদ্ধার।}$$

$$\text{দ} + \text{হ} = \text{দ} + \text{ধ} = \text{দ্ধ} \quad \text{পদ} + \text{হতি} = \text{পদ্ধতি।}$$

এরূপ - উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৬. ত ও দ্ এর পর ল থাকলে ত ও দ্-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন-

$$\text{ত} + \text{ল} = \text{ল্ল} \quad \text{উৎ + লাস} = \text{উল্লাস।}$$

এরূপ - উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লজ্জন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দস্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

$$\text{ক} + \text{দ} = \text{গ} + \text{দ} \quad \text{বাক্ত} + \text{দান} = \text{বাগদান।}$$

$$\text{ট} + \text{য} = \text{ড} + \text{য} \quad \text{ষট্ট} + \text{যন্ত্র} = \text{ষড়যন্ত্র।}$$

$$\text{ত} + \text{ঘ} = \text{দ} + \ঘ \quad \text{উৎ + ঘাটন} = \text{উদ্ঘাটন।}$$

$$\text{ত} + \text{য} = \text{দ} + \text{য} \quad \text{উৎ + যোগ} = \text{উদ্যোগ।}$$

$$\text{ত} + \text{ব} = \text{দ} + \text{ব} \quad \text{উৎ + বন্ধন} = \text{উদ্বন্ধন।}$$

$$\text{ত} + \text{র} = \text{দ} + \text{র} \quad \text{তৎ + রূপ} = \text{তদ্রূপ।}$$

এরূপ - দিপ্পিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উষ্ণব, বাগ্জাল, সদগুরু, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, এও, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :

$$\text{ক} + \text{ন} = \text{গঙ} + \text{ন} \quad \text{দিক্ক} + \text{নির্ণয়} = \text{দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্নির্ণয়।}$$

$$\text{ত} + \text{ম} = \text{দ/ন} + \text{ম} \quad \text{তৎ + মধ্যে} = \text{তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।}$$

লক্ষণীয় : এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঙ্গনই বেশি প্রচলিত। যেমন – বাক + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এরূপ–উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা = শঙ্কা।

ম্ + চ্ = এও + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।

ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ – কিন্তুত, সন্দর্শন, কিন্নুর, সম্মান, সন্ধান, সন্ম্যাস ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম্-এর পর কষ্ট্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ঁ) হয়।

যেমন – সম্ + গত = সংগত, অহম্ + কার = অহংকার, সম্ + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ঁ) হয়। যেমন–

সম্ + যম = সংযম, সম্ + বাদ = সংবাদ, সম্+ রক্ষণ = সংরক্ষণ,

সম্ + লাপ = সংলাপ সম্ + শয় = সংশয় সম্ + সার = সংসার,

সম্ + হার = সংহার।

এরূপ – বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্ভাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

চ্ + ন = চ্ + এও, যাচ্ + না = যাচ়এও, রাজ্ + নী = রাজ্জী।

জ্ + ন = জ্ + এও, যজ্ + ন = যজ্জ,

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, থ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

যেমন –

দ্ > ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল

ধ্ > ত্ ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুণ্পিপাসা।

এরূপ – হৃৎক্রম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্-এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ষ-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

বৃষ্ট + তি = বৃষ্টি, ষষ্ঠি + থ = ষষ্ঠ।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি

উৎ + স্থান = উঠান সম্ + কার = সংস্কার, উৎ + স্থাপন = উঠাপন,

সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিষ্কার।

এরূপ - সংস্কৃতি, পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

আ+ চর্য = আচর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন + পতি = বনস্পতি

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, পর + পর = পরস্পর,

মনস् + ঈষা = মনীষা, ঘট + দশ = ঘোড়শ এক + দশ = একাদশ,

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

৩. বিসর্গ সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত রং ও সং অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্ণধ্বনি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। রং ও সং বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ রং এবং সং-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. রং - জাত বিসর্গ ও ২. সং - জাত বিসর্গ।

১. রং - জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র - জাত বিসর্গ। যেমন : অন্তর - অন্তঃ, প্রাতর - প্রাতঃ, পুনর - পুনঃ ইত্যাদি।

২. সং-জাত বিসর্গ : সং স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে সং-জাত বিসর্গ। যেমন : নমস্ত - নমঃ, পুরস্ত - পুরঃ, শিরস্ত - শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ রং ও সং-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ-ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্ণধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + : + অ - এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন - ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত সং-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অঞ্জপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও সং-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন - তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত রং-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন - অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ।

এরূপ - পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুথান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তবর্তী ইত্যাদি।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, বর্গীয় ঘোষ অঞ্জপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা ষ, র, ল, ব, হ-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে ‘র’ হয়। যেমন-

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এবুপ – নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্গোত্ত, দুরস্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে ‘র’ এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন – নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অঞ্জপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অঞ্জপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন-

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ	নিঃ + চয় = নিচয়, শিরঃ + ছেদ = শিরছেদ।
ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ	ধনুঃ + টঞ্জার = ধনুষঞ্জার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ঃ + ত / থ = স + ত / থ	দুঃ + তর = দুষ্তর, দুঃ + থ = দুষ্থ।

৫. অঘোষ অঞ্জপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কষ্ট্য কিংবা উষ্ট্য ব্যঞ্জন (ক, খ, গ, ঘ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরাস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরাস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ঃ + ক	নমঃ + কার = নমস্কার।
অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ঃ + খ	পদঃ + খলন = পদস্থলন।
ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	নিঃ + কর = নিষ্কর।
উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক	দুঃ + কর = দুষ্কর।

এবুপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্কল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কেণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ। দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ। নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশা= অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। সন্ধি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
- ২। সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নিচের সূত্রগুলো অনুসরণে তিনটি করে উদাহরণ দাও।
 - (ক) মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।
 - (খ) চ ও ঝ-এর পরে নাসিক্যধ্বনি তালব্য এও হয়।
 - (গ) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে র হয়।
- ৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর
 উদ্ধত, বনস্পতি, বারেক, আদ্যন্ত, সম্মাট, ভবন, নয়ন, উজ্জ্বল, অন্বেষণ, সন্তান, নীরোগ, প্রাতরাশ
- ৫। সন্ধি কর
 অভি + উদয়, নিঃ + চিহ্ন, চলৎ +শক্তি, যাবৎ + জীবন, ষষ্ঠি + থ, চিৎ + ময়, খানি + এক, অতঃ + এব, দিক্ +মণ্ডল।
- ৬। কোনটি শুন্ধি নির্দেশ কর
 - ক. স্বরে স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে, স্বরে আর ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। ব্যঞ্জনে আর স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।
 - খ. ব্যঞ্জন সন্ধি এক / দুই/ তিন রকমের।
 - গ. স্বরসন্ধি ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে হয় / স্বরে স্বরে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচেদ

শব্দ প্রকরণ

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সব ভাষায় লিঙ্গাভেদে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে।

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন : বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে- কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ। তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন – বিদ্যান লোক এবং বিদুষী নারী। এখানে ‘লোক’ পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং ‘নারী’ স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। ‘বিদ্যান’ পুরুষবাচক বিশেষণ এবং ‘বিদুষী’ স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন—সংস্কৃতে ‘সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা’ বাংলায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা’।

বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১। বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীজাতীয় অর্থে।

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আবা-আশা, চাচা-চাচী, কাকা-কাকী, জেঠা-জেঠী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নন্দাই-ননদ, দেওর-জা, ভাই-ভাবী/বৌদি, বাবা-মা, মামা-মামী ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে : খোকা-খুকী, পাগল-পাগলী, বামন-বামনী, ভেড়া-ভেড়ী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা, দেওর-ননদ।

২। বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ঈ, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

১. ঈ-প্রত্যয় : বেঞ্জামা-বেঞ্জামী, ভাগনা/ভাগনে-ভাগনী।

২. নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী ইত্যাদি।

৩. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ ই হয়। যেমন : ভিখারি-ভিখারিনী, অভিসারী-অভিসারিণী।

৪. আনী-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি।

৫. ইনী-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী ইত্যাদি।

উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরুন / ঠাকুরানী।

আইন-প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : ঠাকুর-ঠাকুরাইন।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—অভাগা-অভাগী/অভাগিনী, ননদাই-ননদিনী/ননদী ইত্যাদি।

৩। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন— সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

৪। কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন — নর / মদ্দা / হুলো বিড়াল-মেনি বিড়াল; মদ্দা ইঁস-মাদী ইঁস; মদ্দা ঘোড়া-মাদী ঘোড়া; পুরুষ লোক-মেয়েলোক / স্ত্রীলোক; বেটাছেলে-মেয়েছেলে; পুরুষ কয়েদী—স্ত্রী / মেয়ে কয়েদী; ঝঁড়ে বাছুর-বকনা বাছুর; বলদ গৱু-গাই গৱু ইত্যাদি।

৫। কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন— কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার-মহিলা ডাক্তার, সত্য-মহিলা সত্য, কর্মী-মহিলা কর্মী, শিল্পী-মহিলা বা নারী শিল্পী, সৈন্য-নারী / মহিলা সৈন্য, পুলিশ-মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৬। কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন-পো-বোন-ঝি, ঠাকুর-পো-ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, গয়লা-গয়লা-বউ, জেলে-জেলে বউ ইত্যাদি।

৭। অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিনী, ছেলে-মেয়ে, সাতেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলাইন/দুলহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাঁ-মাঁ, বাদশা-বেগম, শুক-সারী ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ই, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—

১. আ-যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শুদ্র-শুদ্রা ইত্যাদি।

২. ঈ-প্রত্যয় যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ঘোড়শ-ঘোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে

(ক) যেসব শব্দের শেষে ‘অক’ রয়েছে সেসব শব্দে ‘ইকা’ স্থলে ‘ইকা’ হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগ হয়। যেমন : নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।)

৪। আনী-যোগ করে : ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ : শূন্দ-শূন্দা (শূন্দ জাতীয় স্ত্রীলোক), শূন্দানী (শূন্দের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

আনী-প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন—অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. ঈনী, নী, যোগে : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

(ক) যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ‘ত্রী’ হয়। যেমন—নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা : সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরীয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শ্বশুরী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবৱ-জা, শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান-খানম, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা।

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অস্বর্যমন্ত্র্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য

- (ক) কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বোঝায়। যেমন— জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।
- (খ) কতগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন—কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।
- (গ) কতগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন— সভীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।
- (ঘ) কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা— দেবর-ননদ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্বী (শিক্ষিকা) (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বন্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী)।
- (ঙ) বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ-সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে-সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো-মেজ খুড়ি ইত্যাদি।
- (চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন— মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগল হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।
- (ছ) কুল-উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ) ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

অনুশীলনী

- ১। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝ ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
- ৩। বাংলায় আগত তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
- ৪। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পাঁচটি উদাহরণ দাও।
- ৫। শুন্ধ কর : বিধবা স্ত্রী, বেগমা
- ৬। পার্থক্য নির্ধারণ কর
দিদি-বৌদি, শিক্ষিকা-শিক্ষিয়ত্বী, আচার্য-আচার্যানী, শূদ্রা-শূদ্রানী
- ৭। ঠিক উভয়ে টিক (✓) দাও।
 - (ক) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ— মা, কন্যা, ছাত্রী, বালিকা, বোন/বিমাতা, বিধবা, বন্ধ্যা, ডাইনী;
 - (খ) নিত্য পুরুষবাচক শব্দ— বাবা, দাদা, হরিণ, পতি, শিশু/ঢাকী, কবিরাজ, কৃতদার;
 - (গ) সংস্কৃত নী প্রত্যয়— মাতুলানী/ইনি প্রত্যয়—মায়াবিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিমুক্ত শব্দ

দ্বিমুক্ত অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিমুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন—‘আমার জ্বর জ্বর লাগছে।’ অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।

দ্বিমুক্ত শব্দ নানা রকম হতে পারে :

(ক) শব্দের দ্বিমুক্তি

১. একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যথা—ভালো ভালো ফল, ফোটা ফোটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।
২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা—ধন—দৌলত, খেলা—ধূলা, লালন—পালন, বলা—কওয়া, খোজ—খবর ইত্যাদি।
৩. দ্বিমুক্ত শব্দ—জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আধিক্য পরিবর্তন হয়। যেমন—মিট—মাট, ফিট—ফাট, বকা—বকা, তোড়—জোড়, গল্ল—সল্ল, রকম—সকম ইত্যাদি।
৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যেমন—লেন—দেন, দেনা—পাওনা, টাকা—পয়সা, ধনী—গরিব, আসা—যাওয়া ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিমুক্তি

১. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন—ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই তেবেছি।
২. দ্বিতীয় পদের আধিক্য ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ—বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন—চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দৃধে ভাতে।

পদের দ্বিমুক্তির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা।

(গ) সর্বনাম শব্দ

- বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিক্ষিণ

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গঞ্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : তয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঘির ঘির করে বাতাস বইছে। বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মারীতিতে দ্বিক্ষিণ শব্দের গঠন

একই শব্দ ইষৎ পরিবর্তন করে দ্বিক্ষিণ শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মারীতি। যুগ্মারীতিতে দ্বিক্ষিণ গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।
২. শব্দের অস্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।
৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, তয়ড়ৱ।
৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

ପଦାଆକ ଦିରୁକ୍ତି

ବିଭିନ୍ନଯୁକ୍ତ ପଦେର ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାରକେ ପଦାଆକ ଦିରୁକ୍ତି ବଲା ହୁଏ । ଏଗୁଳୋ ଦୁଇ ରକମେ ଗଠିତ ହୁଏ । ସେମନ-

୧. ଏକଇ ପଦେର ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାଯ ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାର । ସଥା— ତୟେ ତୟେ ଏଗିଯେ ଗେଲାମ । ହାଟେ ହାଟେ ବିକିଯେ ତୋର ଭରା ଆପଣ ।
୨. ଯୁଗମୀତିତେ ଗଠିତ ଦିରୁକ୍ତ ପଦେର ବ୍ୟବହାର । ସଥା— ହାତେ ନାତେ, ଆକାଶେ-ବାତାସେ, କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼, ଦଲେ-ବଲେ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବିଶିଷ୍ଟାର୍ଥକ ବାଗଧାରାଯ ଦିରୁକ୍ତ ଶଦେର ପ୍ରୟୋଗ

ଛେଲୋଟିକେ ଚୋଖେ ଚୋଖେ ରେଖୋ । (ସତର୍କତା)

ଫୁଲଗୁଲୋ ତୁଇ ଆନରେ ବାଛା ବାଛା । (ଭାବେର ପ୍ରଗାଢ଼ତା)

ଥେକେ ଥେକେ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦାଇଛେ । (କାଲେର ବିସତାର)

ଲୋକଟା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଶୟତାନ । (ଆଧିକ୍ୟ)

ଶୀଚାର ଫୀକେ ଫୀକେ, ପରଶେ ମୁଖେ ମୁଖେ, ନୀରବେ ଚୋଖେ ଚୋଖେ ଯାଏ ।

ଧବନ୍ୟାଆକ ଦିରୁକ୍ତି

କୋନୋ କିଛିର ସାଂତାବିକ ବା କାଙ୍ଗନିକ ଅନୁକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ଶଦେର ରୂପକେ ଧବନ୍ୟାଆକ ଶବ୍ଦ ବଲେ । ଏ ଜାତୀୟ ଧବନ୍ୟାଆକ ଶଦେର ଦୁଇବାର ପ୍ରୟୋଗେର ନାମ ଧବନ୍ୟାଆକ ଦିରୁକ୍ତି । ଧବନ୍ୟାଆକ ଦିରୁକ୍ତି ଦାରା ବହୁତ, ଆଧିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବୋକାଯ । ଧବନ୍ୟାଆକ ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କହେକାଟି ଉପାୟେ ଗଠିତ ହୁଏ । ସେମନ-

୧. ମାନୁଷେର ଧବନିର ଅନୁକାର : ଡେଟ ଡେଟ — ମାନୁଷେର ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ କାନ୍ଦାର ଧବନି । ଏରୂପ — ଟ୍ୟା ଟ୍ୟା, ହି ହି ଇତ୍ୟାଦି ।
୨. ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵର ଧବନିର ଅନୁକାର : ଘେଟ ଘେଟ (କୁକୁରେର ଧବନି) । ଏରୂପ— ମିଟ ମିଟ (ବିଡ଼ାଲେର ଡାକ), କୁକୁ କୁକୁ (କୋକିଲେର ଡାକ), କା କା (କାକେର ଡାକ) ଇତ୍ୟାଦି ।
୩. ବସ୍ତୁର ଧବନିର ଅନୁକାର : ଘଚାଘଚ (ଧାନ କାଟାର ଶବ୍ଦ) । ଏରୂପ— ମଡ଼ମଡ଼ (ଗାଛ ଭେଣେ ପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ) ବମବାମ (ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ), ତୁ ତୁ (ବାତାସ ପ୍ରବାହେର ଶବ୍ଦ) ଇତ୍ୟାଦି ।
୪. ଅନୁଭୂତିଜାତ କାଙ୍ଗନିକ ଧବନିର ଅନୁକାର : ଯିକିମିକି (ଔଞ୍ଚଳ୍ୟ) । ଏରୂପ— ଠା ଠା (ରୋଦେର ତୀତ୍ରତା), କୁଟ କୁଟ (ଶରୀରେ କାମଡ଼ ଲାଗାର ମତୋ ଅନୁଭୂତି) । ଅନୁରୂପଭାବେ— ମିନ ମିନ, ପିଟ ପିଟ, ସି ସି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଧବନ୍ୟାଆକ ଦିରୁକ୍ତି ଗଠନ

୧. ଏକଇ (ଧବନ୍ୟାଆକ) ଶଦେର ଅବିକୃତ ପ୍ରୟୋଗ : ଧକ ଧକ, ଝନ ଝନ, ପଟ ପଟ ।
୨. ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟିର ଶେଷେ ଆ ଯୋଗ କରେ : ଗପାଗପ, ଟପାଟପ, ପଟାପଟ ।
୩. ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟିର ଶେଷେ ଇ ଯୋଗ କରେ : ଧରାଧରି, ଝମବାମି, ଝନବାନି ।

৪. যুগ্মীতিতে গঠিত ধন্যাত্মক শব্দ : কিটির মিটির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোঁথাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।
৫. আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ দ্বিক্ষেত্র গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

বিভিন্ন পদবূপে ধন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্র শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ : বৃষ্টির বামবামানি আমাদের অস্থির করে তোলে।
২. বিশেষণ : ‘নামিল নতে বাদল ছলছল বেদনায়।’
৩. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ‘চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।’

অনুশীলনী

- ১। দ্বিক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় দ্বিক্ষেত্র প্রয়োজনীয়তা কী?
 - ২। বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে দ্বিক্ষেত্র সাধিত হয়?
 - ৩। দ্বিক্ষেত্র সাধনের তিনটি উপায় উদাহরণসহ লেখ।
 - ৪। পাঁচটি করে উদাহরণ দাও
 - (ক) বিপরীতার্থক যুগ্মীতি
 - (খ) সহচর যুগ্মীতি
 - (গ) ধন্যাত্মক যুগ্মীতি
 - ৫। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও
- কানে কানে, ধনে জনে, আকারে প্রকারে, দেশে বিদেশে, রাতে দিনে, তেলে বেগুনে, ঘর সৎসার, ধ্যান ধারণা, চলনে বলনে।

৬। সঠিক উন্নরণ লিখে দাও

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ক. অনুভূতিজাত ধন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্র | : বামবাম/বিমবিম |
| খ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিক্ষেত্র | : হয় না/হয় |
| গ. বিশেষ দ্বিক্ষেত্র | : ভালোয় ভালোয়/উঁচায় নিচায় |
| ঘ. ক্রিয়া দ্বিক্ষেত্র | : যায় যায়/ইঁচি ইঁচি |
| ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিক্ষেত্র | : ধীরে ধীরে/উডু উডু |

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লক্ষ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক ‘এক’। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার

১. অঙ্কবাচক, ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক, ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক।

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা

‘তিন টাকা’ বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোবায়। আমাদের একক হলো ‘এক’। সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুগোন্তর পদ্ধতি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুগোন্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের প্রতিটি ‘দশ’কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চাঁচিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সপ্তাশ (৭০), আশি (৮০), নবাবই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)।

এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক = এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলে বলি দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক = একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ – তিন দশ + এক = একত্রিশ, চার দশ + এক = একচাঁচিশ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন—সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে দিন একটি একক। এরূপ—সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ = এক। যেমন— একেকে এক (অর্থাৎ $1 \times 1 = 1$), এরকম—দুয়েকে দুই, সাতেকে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ= দিগুণ বা দুগুণ। যেমন – দুই দু গুণে চার ($2 \times 2 = 4$)।

অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ ($5 \times 2 = 10$), সাত দু গুণে চৌদ্দ ($7 \times 2 = 14$)। তিন গুণ = তিরিক্তে। যেমন—
তিন তিরিক্তে নয় ($3 \times 3 = 9$)।

চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন— তিন চারে বা চৌকা বার ($3 \times 4 = 12$)

পাঁচ গুণ = পাঁচা। যেমন— পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ($5 \times 5 = 25$)।

ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন— তিন ছয়ে আঠার ($3 \times 6 = 18$)।

সাত গুণ = সাতা। যেমন— তিন সাতা একশ ($3 \times 7 = 21$)

আট গুণ = আটা। যেমন— তিন আটা (বা তে আটা) চারিশ ($3 \times 8 = 24$)।

নয় গুণ = নৎ বা নয়। যেমন— তিন নৎ (বা তিন নয়) সাতাশ ($3 \times 9 = 27$)।

দশ গুণ = দশৎ বা দশ। যেমন— তিন দশৎ (বা তিন দশে) ত্রিশ ($3 \times 10 = 30$)।

বিশ গুণ = বিশৎ বা বিশ। যেমন— তিন বিশৎ (বা তিন বিশ) ষাট ($3 \times 20 = 60$)।

ত্রিশ গুণ = ত্রিশৎ বা ত্রিশ। যেমন— তিন ত্রিশৎ (বা তিন ত্রিশ) নববই ($3 \times 30 = 90$)।

এরূপ— চালিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নববই, বা শ’—এর প্রণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।

পূর্ণসংখ্যার নৃনতা বা আধিক্য বাচক ‘সংখ্যা শব্দ’

(ক) নৃন

এক এককের চার ভাগের এক ভাগ $(\frac{1}{4})$ = চৌথা, সিকি বা পোয়া।

” ” তিন ভাগের ” ” $(\frac{1}{3})$ = তেহাই।

” ” দুই ভাগের ” ” $(\frac{1}{2})$ = অর্ধ বা আধা।

” ” আট ভাগের ” ” $(\frac{1}{8})$ = আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাশ।

তেমনি— এক পঞ্চমাশ ($\frac{1}{5}$), এক দশমাশ ($\frac{1}{10}$) ইত্যাদি। এ সবের আরও ভাগ্নি হলে, যেমন— চার ভাগের তিন ($\frac{3}{4}$) = তিন চতুর্থাশ। আট ভাগের তিন ($\frac{3}{8}$) = তিন অষ্টমাশ ইত্যাদি। এক এককের ($\frac{3}{8}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। যেমন— পৌনে তিন = $(2 \frac{3}{8})$, পৌনে ছয় = $(5 \frac{3}{8})$ ইত্যাদি।

পৌনে অর্থ পোয়া অংশ বা এক চতুর্থাশ ($\frac{1}{4}$) কম। অর্থাত পৌনে = $(1 - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$ ।

সওয়া = $1 \frac{1}{8}$ (সওয়া বা সোয়া এক)

দেড় = $1 \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ কম ২।

আড়াই = $2 \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বত্র ‘সাড়ে’ বলা হয়। যেমন— $3 \frac{1}{2}$ = সাড়ে তিন, $8 \frac{1}{2}$ = সাড়ে চার ইত্যাদি।

৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা প্রণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন— দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় ‘প্রথম’ এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এরূপ— তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন—পঞ্চা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো।

অঙ্ক বা সংখ্যা	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিনি	তৃতীয়	তেসরা
৪	চারি	চতুর্থ	চোঠা
৫	পাঁচি	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়ি	ষষ্ঠি	ছড়ই
৭	সাতি	সপ্তম	সাতই
৮	আটি	অষ্টম	আটই
৯	নয়ি	নবম	নউই
১০	দশি	দশম	দশই
১১	এগারি	একাদশ	এগারই
১২	বারি	দ্বাদশ	বারই
১৩	তেরি	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দি	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনেরি	পঞ্চদশ	পনেরই
১৯	উনিশি	উনবিংশ	উনিশে
২০	বিশি/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশি	একবিংশ	একুশে

অনুশীলনী

- অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক রূপ দেখাও।
- নিচের শব্দগুলোকে সংখ্যা শব্দে দেখাও:

চৌথা, নবম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, আড়াই, পৌনে চারি, সওয়া তিনি, একবিংশ, উনবিংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বচন

‘বচন’ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : একবচন ও বহুবচন।

একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন – সে এলো। মেঘেটি স্কুলে যাইনি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাত বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহু বচন বলে। যেমন : তারা গেল। মেঘেরা এখনও আসেনি।

কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গুরুটা, বাচ্চুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রত্তি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃদ্ধ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রত্তি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন –

(ক) রা—কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা’ বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন— ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে ‘রা’ যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় ‘এরা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মেঘেরা ঝিয়েরা একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন – ‘পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিঙ্গলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়।’ কাকেরা এক বিরাট সভা করল।

(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – অতগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে? আমগুলো টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। ময়ুরগুলো পুছ নাড়িয়ে নাচছে।

(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

- | | | |
|--------|---|--|
| গণ | - | দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি। |
| বৃদ্ধ | - | সুধীবৃদ্ধ, ভক্তবৃদ্ধ, শিক্ষকবৃদ্ধ ইত্যাদি। |
| মণ্ডলী | - | শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি। |
| বর্গ | - | পঞ্জিবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি। |

(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

- | | | |
|------|---|--|
| কুল | - | কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি। |
| সকল | - | পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি। |
| সব | - | ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি। |
| সমূহ | - | বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি। |

(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ

আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঁজি, মালা, রাজি, রাশি। যেমন- গ্রন্থাগারে রাঙ্কিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘবুঝি, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : পাল ও যুথ শব্দ দুটি কেবল জন্মের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন – রাখাল গুরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
হস্তিযুথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

- (ক) বিশেষ শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন – সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বোঝায়)। গোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)।
- (খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্ত, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, চের ইত্যাদি বহুবোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন- অজস্ত লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, চের খরচ, অচেল টাকা পয়সা ইত্যাদি।
- (গ) অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বি- প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন – হাড়ি হাড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। শাল শাল ফুল।
- (ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য – মেঘেরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

- (ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন – আন যোগে : বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাত সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বাংলা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের – এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব – এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন – সব মানুষই অথবা মানুষেরা মরণশীল (শুন্দি)। সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)।

অনুশীলনী

- ১। বচন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের উপায় কী কী? দশটি বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।
- ৩। প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দে যেসব বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তার তিনটি করে উদাহরণ দাও।
- ৪। বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।
- ৫। ভুল থাকলে শুন্দর কর।
আমাদের স্কুলের সকল ছাত্রাই আজ সভায় উপস্থিত। সব গরুগণেরা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে।
প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এ খবর দিয়ে দাও। ভাইগণ, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।
- ৬। ক. ডান দিক থেকে যথাযোগ্য শব্দটি এনে বাঁ দিকের শিরোনামের ডানে বসাও।

একবচন – ছাত্র, মা, তোমরা, পাখিগুলো, গরু, দেশ
বহুবচন – লোকেরা, তাদের, ধনী, গরিব, বেড়াল।

খ. ডান দিক থেকে বহুবচনবোধক শব্দ / শব্দাংশ নিয়ে বাঁ দিকের শব্দে যোগ কর

কুমুম, ফল, ভাই, দোকান, সাধু কলম, স্যার, মাথা, কাপড়, বই	গুলা, রা, এরা
--	---------------

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদাশ্রিত নির্দেশক

কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The'-এর স্থানীয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

- (ক) একবচনে – টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন– টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।
- (খ) বহুবচনে – গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন – মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

১. (ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– তিনটি টাকা, দশটি বছর।
- (খ) নির্ধৰ্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন–সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকমিটা এখন রাখ।
- (গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন – শুটি যেন কার তৈরি? এটা নয় শুটা আন। সেইটেই ছিল আমার প্রিয় কলম।
২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন–
গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। গোটাদুই কমলালেৰু আছে (অনির্দিষ্ট)। দুখানা কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। গোটাসাতেক আম এনো। একখানা বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।
- কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ
সাধনখানি।'
৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
যেমন – পোয়াটাক দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।
৪. বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন–
তা : দশ তা কাগজ দাও।
পাটি : আমার একপাটি জুতো ছিড়ে গেছে।

অনুশীলনী

- ১। পদাশ্রিত নির্দেশক কাকে বলে? বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকদের কী রূপভেদ হয়?
- ২। টি, টা, খানা, খানি – এ চারটি পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা কর।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর
 পাঁচেক,
 টি,
 মুখ,
 দুধ

- ৪। শুন্ধ কর

দুখানি নয় চারখানি নয়, একগোটা ছেলে আমার। মুখ কিতা টুকুটুকে লাল। দেশখানির নামটুকুন কী?
দশগোটা বেজেছে।

- ৫। ভুল থাকলে শুন্ধ করে দেখ

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| (ক) টা, টি, খানা, খানি | - | বহু বচনে ব্যবহৃত হয়। |
| (খ) রা, এরা, গুলি, গুলা | - | এক বচনে ব্যবহৃত হয়। |
| (গ) টুকু, টুকুন | - | স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। |
| (ঘ) তা, পাটি | - | শব্দের আগে বসে। |

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাঞ্ছায় এসেছে। তবে খাঁটি বাঞ্ছা সমাসের দ্রষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবন্ধ বা সমাসনিষ্ঠান পদটির নাম সমস্ত পদ।

সমস্ত পদ বা সমাসবন্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় উভরপদ বা পরপদ।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিশ্ববাক্য। উদাহরণ—বিলাত—ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত—ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন – এ তিনটিই সমাসবন্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম – বিলাত হতে ফেরত, রাজাৰ কুমার, সিংহ চিহ্নিত আসন – এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে ‘বিলাত’, ‘ফেরত’, ‘রাজা’, ‘কুমার’, ‘সিংহ’, ‘আসন’ হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত—ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুবীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুবীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অনুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – তাল ও তমাল = তাল–তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত–কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাকেয় এবং , ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস করেক প্রকারে সাধিত হয়।

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জিন্ন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, সর্গ-নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুঠু, নাক-মুখ ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
৬. সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাগড়-চোগড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঞ্জিতে ইত্যাদি।
১১. দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

অঙ্গুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অঙ্গুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন – দুধে-তাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস করেক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃতন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া
পরে মোছা = ধোয়ামোছা।
৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে
লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, ‘মহৎ’ ও ‘মহান’ স্থানে ‘মহা’ হয়। যেমন – মহৎ
যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।
৬. পূর্বপদে ‘কু’ বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে ‘কু’ স্থানে ‘কৎ’ হয়। যেমন
– কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।
৭. পরপদে ‘রাজা’ শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে ‘রাজ’ হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।
৮. বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে
যায়। যেমন – সিন্ধ যে আলু = আলুসিন্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোগী, উপমান, উপমিত ও বৃপক কর্মধারয় সমাস।

১. মধ্যপদলোগী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোগী
কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, সূতি
রক্ষার্থে সৌধ = সূতিসৌধ।
২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে
প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও
উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমণের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমণ উপমান
এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়,
তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙ্গা = অরুণরাঙ্গা।
৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয়ের পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে
উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয়ের পদটি
পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চপ্টের ন্যায় = চপ্টমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।
৪. বৃপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কঙ্গনা করা হলে বৃপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে
উপমেয়ের পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে ‘বৃপ’ অর্থবা ‘ই’ যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন
করা হয়। যেমন- ক্রোধ বৃপ অনঙ্গ = ক্রোধানঙ্গ, বিষাদ বৃপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন বৃপ মাবি= মনমাবি।
- আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে
বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – অব্যয় : কুকর্ম, যথাযোগ্য। সর্বনাম :
সেকাল, একাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : একজন, দোতলা। উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর।

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন – বিপদকে আপন্ন= বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ্চ, উপপদ ও অনুক তৎপুরুষ সমাস।

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। এরকম : গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাখা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নঙ্গে-পড়া ইত্যাদি।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (ঘারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : এক দ্বারা উন = একেন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম।

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত। এরূপ-হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা= আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ-ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঞ্জল, মুসাফিরখানা, হজ্বযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা – খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সাধারণত ছ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উভীর্ণ, পালানো, অষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বোটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঝণমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ‘এর’ ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্ণের ব্যবহার হয়। যথা— পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে যষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপভাবে – ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শুশ্রবাড়ি, বিড়লছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ‘রাজা’ স্থলে ‘রাজ’, পিতা, মাতা, ভাতা স্থলে যথাক্রমে ‘পিতৃ’, ‘মাতৃ’, ‘ভাতৃ’ হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভাতার মেহ = ভাতৃমেহ, পুত্রের বধ = পুত্রবধু ইত্যাদি।
২. পরপদে সহ, তুল্য, নিত, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ = পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।
৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা— অহের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ।
৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যুথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা— ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যুথ = হস্তীযুথ ইত্যাদি।
৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ = অর্ধপথ, দিনের অর্ধ = অর্ধদিন।
৬. শিশু, দুর্ঘ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্তুবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুর্ঘ = ছাগদুর্ঘ ইত্যাদি।
৭. ব্যাসবাক্যে ‘রাজা’ শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- অঙ্গুক যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভাতার পুত্র = ভাতৃপুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।
৯. সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সম্মতমী বিভক্তি (এ, য, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। এরূপ – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, তোজনপটু, দানবীর, বাঞ্ছবান্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

সম্মতী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন – পূর্বে
ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদ্যুষ্ট = অদ্যুষ্টপূর্ব।

৭. নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস : না বাচক নঞ্চ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ – অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

খাটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদুপ- আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা-

অভাব	-	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)
ভিন্নতা	-	ন	লোকিক	=	অলোকিক ।
অল্পতা	-	ন	কেশা	=	অকেশা ।
বিরোধ	-	ন	সুর	=	অসুর ।
অপ্রশস্ত	-	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	-	ন	ঘাট	=	অঘাট ।

এরূপ – অমানুষ, অসঙ্গত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন – জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঞ্জে জন্মে যা = পঞ্জজ। এরূপ – গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা-পোষা ইত্যাদি।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভিন্ন লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ-ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাঢ়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : গায়ে-হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুবৰ্তী সমাস।

৪. বহুবৰ্তী সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুবৰ্তী সমাস বলে। যথা- বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুবৰ্তী। এখানে ‘বহু’ কিংবা ‘ব্রীহি’ কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুবীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত শেচন যার = আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আআ যার = মহাআ, সচ্চ সলিল যার = সচ্চসলিলা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।

‘সহ’ কিংবা ‘সহিত’ শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুবীহি সমাস হলে ‘সহ’ ও ‘সহিত’ এর স্থলে ‘স’ হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদ্র যার = সহোদ্র > সোদ্র। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে পরপদে মাত্, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে ‘ক’ যুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাত্) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ – সম্মতীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে সমস্ত পদে ‘অক্ষি’ শব্দের স্থলে ‘অক্ষ’ এবং ‘নাভি’ শব্দ স্থলে ‘নাভ’ হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ। এরূপ – উর্ণনাভ।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘জায়া’ শব্দ স্থানে ‘জানি’ হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জায়া যার = যুবজানি (যুবতী স্থলে ‘যুব’ এবং ‘জায়া’ স্থলে জানি হয়েছে)।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘চূড়া’ শব্দ সমস্ত পদে ‘চূড়’ এবং ‘কর্ম’ শব্দ সমস্ত পদে ‘কর্মা’ হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুবীহি সমাসে ‘সমান’ শব্দের স্থানে ‘স’ এবং ‘সহ’ হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদ্র যাদের = সহোদ্র।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘গন্ধ’ শব্দ স্থানে ‘গন্ধি’ বা ‘গন্ধা’ হয়। যথা : সুগন্ধ যার = সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুবীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুবীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ্চ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যবাচক বহুবীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুবীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুবীহি

বহুবীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুবীহি। যথা : আশীতে (দাতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বঁটা খসেছে যার = বঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

৩. ব্যতিহার বহুবীহি

কিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুবীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উত্তরপদে ‘ই’ যুক্ত হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে – চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪. নঞ্চ বহুবীহি

বিশেষ পূর্বপদের আগে নঞ্চ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুবীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্চ বহুবীহি বলে। নঞ্চ বহুবীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম–নাহক, নিরূপায়, নির্বাঙ্গাট, অবুবা, অকেজো, বে-পরোয়া, বেঁশ, অনস্ত, বেতার ইত্যাদি।

৫. মধ্যপদলোগী বহুবীহি

বহুবীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে গোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোগী বহুবীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি ভাবে – গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যাদি।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি

যে বহুবীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি। যথা— এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখ (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচে (খরচ+এ)। এরকম –দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৭. অলুক বহুবীহি

যে বহুবীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুবীহি বলে। অলুক বহুবীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)। এরূপ – হাতে-ছড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়-ছাতা, মুখে-ভাত, কানে-খাটো ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাবাচক বহুবীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুবীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে ‘আ’, ‘ই’ বা ‘ঙ্গ’ যুক্ত হয়। যথা – দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা। এরূপ – চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিন্তু, সে (তিনি) তার (যে যন্ত্রে) = সেতার (বিশেষ্য)।

৯. নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুবৰ্তী

দু দিকে অপ যার = দীপ, অঙ্গৰত অপ যার = অঙ্গীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্ত, পঞ্চিত হয়েও যে মূর্খ = পঞ্চিতমূর্খ ইত্যাদি।

৫. দিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয়, তাকে দিগু সমাস বলে। দিগু সমাসে সমাসনিষ্পত্তি পদটি বিশেষ পদ হয়। যেমন : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অন্দের সমাহার-শতাদ্বী, পঞ্চবটের সমাহার-পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার-ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ-অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গা, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পত্তি সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় ‘আ’) = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রত্বতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ) : কঠের সমীপে = উপকর্ত, কুলের সমীপে = উপকূল।
২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।
৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
৪. পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।
৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ-যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
৭. অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্দেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।
৮. বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
৯. পশ্চাত (অনু) : পশ্চাত গমন = অনুগমন, পশ্চাত ধাবন = অনুধাবন।

১০. ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।
১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।
(পরি বা সম)
১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অঙ্কির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ - প্রপিতামহ।
১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।
১৫. প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুষ্মান।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপগদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

১. প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ - পরি (চতুর্দিকে) যে অমণ = পরিঅমণ, অনুত্তে (পক্ষাতে) যে তাপ = অনুত্তাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।
২. নিত্যসমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবন্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামাঞ্চল, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহাঞ্চল, (বিষাঙ্গ) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নববই = বিরানববই।

অনুশীলনী

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।
৩. ‘দিগ্বু সমাস প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা সমাস নয়, এটি কর্মধারয় সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত’-আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
৪. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।
৫. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে সবগুলো তৎপুরুষ সমাসের নাম কর।
৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দম্পতি, ধানক্ষেত, প্রগতি, বেতার, সহশিক্ষা।
৭. মধ্যপদলোগী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোগী বহুবীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৮. উদাহরণ দাও

সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয়, অলুক তৎপুরুষ, বহুবীহি সমাসের ‘সহ’ স্থলে ‘স’ হয়, অব্যয় পদ আগে বসে যে সমাস হয়, উপমেয়ের সাথে উপমানের যে সমাস হয়।

৯. ঠিক উন্নতিতে ঠিক (✓) দাও

ক. তৎপুরুষ সমাস হয় – পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় / সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদে যে সমাস হয় / পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয়।

খ. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সে সমাস হয় তাকে বলে – দ্বন্দ্ব / বহুবীহি / অলুক / দ্বিগু সমাস।

গ. উপমান–উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে বলে – নিত্যসমাস / প্রাদি সমাস / কর্মধারয় সমাস।

১০. সমাসবন্ধ শব্দ লেখ এবং ডান দিক থেকে ঠিক সমাসের নামটি পাশে লেখ—

কাঁচা অথচ মিঠা	: তৎপুরুষ	মা মরেছে যার	: অব্যয়ীভাব
মহান যে নবি	: কর্মধারয়	দশ হাত পরিমাণ যার	: বহুবীহি
দুধে ভাতে	: দ্বন্দ্ব	তিন ফলের সমাহার	: দ্বিগু।
বিলাত থেকে ফেরত	: তৎপুরুষ		

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাকে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। এবং
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – ‘কাজ’ একটি শব্দ। এর আগে ‘অ’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘অকাজ’ – যার অর্থ নিষ্ঠনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

‘পূর্ণ’ (ভরা) শব্দের আগে ‘পরি’ যোগ করায় ‘পরিপূর্ণ’ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। ‘হার’ শব্দের পূর্বে ‘আ’ যুক্ত করে ‘আহার’ (খাওয়া), ‘প্র’ যুক্ত করে ‘প্রহার’ (মারা), ‘বি’ যুক্ত করে ‘বিহার’ (ভ্রমণ), ‘পরি’ যোগ করে ‘পরিহার’ (ত্যাগ), ‘উপ’ যোগ করে ‘উপহার’ (পুরস্কার), ‘সম’ যোগ করে ‘সহার’ (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিনি প্রকার উপসর্গ আছে : বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো।

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
১. অ	নিষ্ঠিত	অর্থে
-	অভাব	”
-	ক্রমাগত	”

উপসর্গ	অর্থদেয়োত্তরকতা		উদাহরণ
২.	অঘা	বোকা	অর্থে অঘারাম, অঘাচষ্টী
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	" অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
৪.	অনা	অভাব	" অনাবৃষ্টি, অনাদর
	-	ছাড়া	" অনাছিষ্টি, অনাচার
	-	অশুভ	" অনামুখো
৫.	আ	অভাব	" আকাঁড়া, আধোয়া, আচুনি
	-	বাজে, নিকৃষ্ট	" আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্র	" আড়চোখে, আড়নয়নে
	-	আধা, প্রায়	" আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	-	বিশিষ্ট	" আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	" আনকোরা
	-	বিক্ষিষ্ট	" আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	" আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	" ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	-	পুরনো	" ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	উন (উনা)	কম	" উনপাইজুরে, উনিশ
১১.	কদ্	নিষিদ্ধ	" কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপর্কৰ	" কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসজ্জা
১৩.	নি	নাই/নেতি	" নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিঙ্গাজ, নিরেট
১৪.	পাতি	ক্ষুদ্র	" পাতিহাস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিষদনীয়	" বিত্তুই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভৱ	পূর্ণতা	" ভরপেট, ভরসীঁঝা, ভরপূর, ভরদুপূর, ভরসম্মেধ্য
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	" রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	" সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	" সাজিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উন্নত	" সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	" হাপিত্যেশ, হাতাতে, হাঘরে

জ্ঞাতব্য : বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ : ‘আমি অবেলাতে দিলাম পাড়ি অটৈ সায়রে।’ অঘারাম বাস করে অজ পাড়াগায়ে। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। আকাঠার নায়ে দিলাম কাঁঠালের গলুই। ‘মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।’ ইতিহাস কথা কয়। উনাভাতে দুনা বল। নিনাইয়ার শতেক নাও। তর দুপুরে কোথায় যাও? এতদিন কোথায় নিখোঝ হয়েছিলে?

২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকেচন সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশিটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি- এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন –আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও বাংলা। আর আকষ্ট, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদায় তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ।

নিচে বিশিটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১.	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক
	-	খ্যাতি
	-	আধিক্য
	-	গতি
	-	ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিত
২.	পরা	আতিশয্য
	-	বিপরীত
৩.	অপ	বিপরীত
	-	নিকৃষ্ট
	-	স্থানান্তর
	-	বিকৃত
		অভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
		প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
		প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
		প্রবেশ, প্রস্থান
		প্রগৌত্র, প্রশাখা,
		পরাকৃষ্টা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
		পরাজয়, পরাভব
		অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
		অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসূষ্টি, অপযশ
		অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
		অপমৃত্যু

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	অর্থে	উদাহরণ
৪.	সম্	সম্যক রূপে	সম্পূর্ণ, সম্মধ, সমাদর
	-	সমুখে	সমাগত, সমুখ
৫.	নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
	-	নিশ্চয়	নিবারণ, নির্ণয়
৬.	-	আতিশয়	নিদাঘ, নিদাঘণ
	-	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৭.	অব	ইনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
	-	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	-	নিম্নে/অধোমুখিতা	অবতরণ, অবরোহণ
৮.	-	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেগা
	অনু	পচাঃ	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	-	সাদৃশ্য	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
৯.	-	গৌণঃপুন	অনুক্ষণ, অনুদিল, অনুশীলন
	-	সঙ্গে	অনুকূল, অনুকম্পা
	নির	অভাব	নিরব, নির্জীব, নিরহজ্ঞকার, নিরাশ্রয়, নির্ধন
১০.	-	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	-	বাহির/বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
	দূর	মন্দ	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
১১.	-	কষ্টসাধ্য	দুর্ভিত, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
	বি	বিশেষ রূপে	বিধৃত, বিশুম্ব, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক
	-	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
১২.	-	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ
	-	অপ্রকৃতস্থ	বিকার, বিপর্যয়
	সু	উন্নত	সুকর্ষ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
১৩.	-	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	-	আতিশয়	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
	উৎ	উৎবর্মুখিতা	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিণ্ড, উদ্গীব, উদ্ভোলন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১৩.	-	আতিশয়	অর্থে
	-	প্রস্তুতি	উচ্চেদ, উন্নত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎগীড়ন
	-	অপকর্ষ	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	-	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	-	ব্যাপ্তি	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
১৪.	পরি	বিশেষ রূপ	পরিপন্থ, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	-	শেষ	পরিশেষ
	-	সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
১৫.	-	চতুর্দিক	পরিভ্রমণ, পরিমন্ডল
	প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	-	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিহন্ত্বী
	-	পৌনঃপুন	প্রতিদিন, প্রতিমাস
১৬.	উপ	অনুবূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
		সামীপ্য	উপকূল, উপকর্ত
		সদৃশ	উপদ্বাপ, উপবন
		ক্ষুদ্র	উপছত, উপসাগর, উপনেতা
		বিশেষ	উপনয়ন (গৈতা), উপভোগ
১৭.	অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
	-	গমন	অভিযান, অভিসার
	-	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
১৮.	অতি	আতিশয়	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	-	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃ
১৯.	আ	পর্যন্ত	আকর্ত, আমরণ, আসমুদ্র
	-	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	-	বিপরীত	আদান, আগমন
২০.	অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি

বাক্যে তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ

কালের প্রভাবে নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। ওসমান রণক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেও পরাজিত হলেন। সমাগত সুধীজনকে সাদর অভিনন্দন জানানো হলো। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান নেই বলে তাঁর দৃঢ়খের সীমা-পরিসীমা নেই।

৩. বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি – এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে ‘মালুম’ আরবি শব্দ আর ‘বে’ ফারসি উপসর্গ। এরূপ– বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
১. কার্	কাজ	কার্থানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
২. দর	মধ্যস্থ, অধীন	” দরপত্নী, দরপাট্টা, দরদালান
৩. না	না	” নাচার, নারাজ, নামঙ্গুর, নাখোশ, নালায়েক
৪. নিম্	আধা	” নিমরাজি, নিমখুন
৫. ফি	প্রতি	” ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাস
৬. বদ্	মন্দ	” বদমেজাজ, বদরাণ্ডী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
৭. বে	না	” বেআদব, বেআকেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
৮. বর্	বাইরে, মধ্যে	” বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
৯. ব্	সহিত	” বমাল, বনাম, বকলম
১০. কম্	স্বল্প	” কমজোর, কমবখ্ত

খ. আরবি উপসর্গ

১.	আম্	সাধারণ	”	আমদরবার, আমমোক্তার
২.	খাস	বিশেষ	”	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩.	লা	না	”	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
৪.	গর	অভাব	”	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	অর্থে	উদাহরণ
১. ফুল	পূর্ণ	”	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট
২. হাফ	আধা	”	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট
৩. হেড	প্রধান	”	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-প্রিডিক্ট, হেড-মৌলভি
৪. সাব	অধীন	”	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর

ঘ. উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে – হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ

হিসেবে গৱামিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে। বহাল তবিয়তে দস্তখত করে ফি-রোজ হেড অফিসে আসা যাওয়া কর।

অনুশীলনী

- ১। উপসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কয় শ্রেণির উপসর্গের ব্যবহার আছে? প্রত্যেক শ্রেণির পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।
- ২। ‘উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ-দ্যোতকতা আছে।’ – বিশদ ব্যাখ্যা কর।
- ৩। বাংলা, তৎসম, বিদেশি- প্রত্যেক শ্রেণির তিনটি করে উপসর্গের উদাহরণ দিয়ে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
- ৪। অর্থ উল্লেখ করে বাক্য রচনা কর
দরকাঁচা, বরবাদ, ফি-হস্তা, না-মঞ্জুর, বেহেড, কারখানা, লা-জওয়াব, অনুগমন, অতিবৃষ্টি, প্রতিদিন, বদনজর
- ৫। পার্থক্য নির্দেশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও
বনাম-বেনাম; সুবাদ-অপবাদ; বহাল-বেহাল; বিগত-আগত; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; অনুজ্ঞা-অবজ্ঞা;
- ৬। শুন্ধ হলে (/) চিহ্ন এবং অশুন্ধ হলে (x) চিহ্ন দাও।
 - ক. উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
 - খ. অন্য শব্দের আগে বসে।
 - গ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয় না।
 - ঘ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটে।
- ৭। নিচের কোনটি কোন ধরনের উপসর্গ?
নিখাদ, প্রতিদিন, ফি-বছর, বেহায়া, অনুসরণ, উপহার, আগুনি, বেতমিজ, নিখুঁত, ফুলবাবু, বিভুঁই, ৯০
অনুবাদ, পাতিহাঁস, রামছাগল, নিমরাজি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর সাধারণ আলোচনা

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যকথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন - ‘করে’ একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে : কর + এ; এখানে ‘কর’ ধাতু এবং ‘এ’ বিভক্তি। সুতরাং ‘করে’ ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো ‘কর’ আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো ‘এ’। অন্যকথায় ‘কর’ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘করে’ ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

প্রচলিত বেশিকিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটা উপায় হলো : বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা। কারণ, এই রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন - কর, খা, যা, ডাক, দেখ, দেখ ইত্যাদি। এগুলো যেমন ধাতুও, তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদও।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু তিন প্রকারের : (১) মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন - চল, পড়, কর, শো, হ, খা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) বাংলা, (খ) সংস্কৃত এবং (গ) বিদেশি ধাতু।

ক. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন - কাট, কাঁদ, জান, নাচ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন - কৃ, গম, ধৃ, গঠ, স্থা ইত্যাদি।

এখানে সংস্কৃত ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক	আঁকা
কথ	কথ্য, কথিত	কহ	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর	করা, করে

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
ক্রস্ত্	ক্রস্তন	কান্দ	কান্দা, কানুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়	গড়া, গড়ন
ঘষ্	ঘষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ	ঘষা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
ধ্	ধৃত, ধারণ	ধর	ধরা, ধরন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়	পড়া, পড়ন
বন্ধ্	বন্ধন	বাঁধ	বাঁধন, বাঁধা
বুধ্	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ	বুঝা
রক্ষ	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ	রাখা
শ্ৰ	শ্রবণ, শ্রুত	শুন	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক	থাকা
হস	হাস, হাসন	হস	হাসা, হাসি

গ. বিদেশাগত ধাতু : প্রধানত হিন্দি এবং বৃটিং আরবি-ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশাগত ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলা হয়। যেমন – ভিক্ষে মেগে খায়। এ বাকে ‘মাঙু’ ধাতু হিন্দি ‘মাঙ’ থেকে আগত। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু। যেমন – ‘হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?’ এ বাকে ‘হের’ ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

এখানে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো।

ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়
আঁট	শক্ত করে বাঁধা	ফির	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ	প্রার্থনা করা
চেঁচ	চিত্কার করা	বিগড়	নষ্ট হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ	সিক্ত হওয়া
ঝুল্	দোলা	ঠেল	ঠেলা
টান্	আকর্ষণ	ভাক	আহ্বান করা
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক	বুলানো
ডৱ	জীত হওয়া		

২. সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম -শব্দের সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন - দেখ + আ= দেখা, পড় + আ= পড়া, বল + আ= বলা। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন - মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ + আ + বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ‘য়’ = দেখায়)। এরূপ -শোনায়, বসায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিন শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. নাম ধাতু, খ. প্রযোজক (নিজস্ত) ধাতু, (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তা-ই নাম ধাতু। যেমন -সে ঘুমাচ্ছে। ‘ঘুম’ থেকে নাম ধাতু ‘ঘুমা’। ‘ধর্মক’ থেকে নাম ধাতু ‘ধর্মকা’। যেমন আমাকে ধর্মকিণি না।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা নিজস্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন - কর + আ= করা (এখানে ‘করা’ একটি ধাতু)। যেমন - সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুপ্রভাবে- পড় + আ=পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু : মৌলিক ধাতুর সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথা - দেখ + আ= দেখা; কাজটি ভালো দেখায় না। হার + আ= হারা; ‘যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।’

‘কর্মবাচ্যের ধাতু’ বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন - ‘দেখায়’ এবং ‘হারায়’ প্রযোজক ধাতু।

৩. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা-ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন - যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর (ধাতু) = ‘যোগ কর’ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) + হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- এখনও সাবধান হও, নতুনা আখেরে খারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. কর-ধাতু যোগে

ক. বিশেষ্যের সঙ্গে	:	তয় কর, লজ্জা কর, গুণ কর
খ. বিশেষণের সঙ্গে	:	ভালো কর, মন্দ কর, সুখী কর
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ক্রয় কর, দান কর, দর্শন কর, রান্না কর
ঘ. ক্রিয়াজাত (কৃদণ্ড) বিশেষণের সঙ্গে	:	সঞ্চিত কর, স্থগিত কর
ঙ. ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে	:	জলাদি কর, তাঢ়াতাঢ়ি কর, একত্র কর

চ. অব্যয়ের সঙ্গে	: না কর, হাঁ কর, হায় হায় কর, ছি ছি কর
ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে	: থাঁ থাঁ কর, বন বন কর, টন টন কর
জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে :	চট কর, ধী কর, হন হন কর
২. হ-ধাতু যোগে	: বড় হ, ছেট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ
৩. দে-ধাতু যোগে	: উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে
৪. পা-ধাতু যোগে	: কাল্পা পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা
৫. খা-ধাতু যোগে	: মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা
৬. কাট-ধাতু যোগে	: সাঁতার কাট, তের্থচি কাট, জিন্দ কাট
৭. ছাড়-ধাতু যোগে	: গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়
৮. ধৱ-ধাতু যোগে	: গলা ধৱ, ঘুণে ধৱ, পচা ধৱ, মাথা ধৱ, গৌ ধৱ।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু বলতে কী বোঝ? ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চেনার উপায় কী?
- ২। ধাতু কয় প্রকার ও কী কী? সংকৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ৩। নিচের সাধিত পদসমূহের ধাতু নির্ণয় কর এবং সাধিত ধাতুটি তৎসম হলে তার বাংলা রূপ এবং বাংলা হলে তার তৎসম রূপ নির্ণয় করে বাকেয় প্রয়োগ দেখাও :
 - খাদ্য, কথিত, বুঝ, নাচন, কথা, দৃশ্য, শেখা, দর্শন
- ৪। সাধিত ধাতু কী? সাধিত ধাতু কয় ভাগে বিভক্ত? এদের নাম লেখ।
- ৫। “বিভিন্ন পদের সঙ্গে ‘কর’ বা ‘খা’ ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়” – উদাহরণ দাও।
- ৬। ক. কোন্টি ঠিক? ধাতু- দুই প্রকার/ তিন প্রকার/ চার প্রকার
 খ. বিদেশি ধাতু কোন্টি ? কাট / কৃৎ / টান
- ৭। ডান দিক থেকে শব্দ এনে ঠিক সংজ্ঞার পার্শ্বে বসাও
 মৌলিক ধাতু ----- কৃ, চল, গড়, খাদ্য, আঁট
 সাধিত ধাতু ----- শোনায়, বসায়, মুচড়ানো
 যৌগিক ধাতু----- উত্তর দে, মার খা, ভয় পা।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা

তোমরা লক্ষ করেছ যে, ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কালবাচক বিভিন্ন যোগ করে গঠন করা হয় ক্রিয়াগদ। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি; আর (২) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে কৃৎ-প্রত্যয়। যেমন- চল্ল (ক্রিয়া প্রকৃতি)+ অন (কৃৎ-প্রত্যয়)= চলন (বিশেষ্য পদ)। চল্ল (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন্ত (কৃৎ-প্রত্যয়)= চলন্ত (বিশেষণ পদ)।

‘প্রকৃতি’ কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে \checkmark চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে ‘প্রকৃতি’ শব্দটি সেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন- \checkmark গড়+ উয়া = পড়য়া। \checkmark নাচ+ উনে = নাচনে।

কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। যেমন - শুগরের উদাহরণে ‘পড়য়া’ ও ‘নাচনে’ কৃদন্ত পদ।

তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়। যেমন - \checkmark গম্ম+অন=গমন, \checkmark কৃ+তব্য=কর্তব্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি।

১. গুণ : (ক) ই, ই-স্থলে এ, (খ) উ, উ-স্থলে ও এবং (গ) ঝ-স্থলে অৱ হয়। যেমন - \checkmark চিন্ন+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); \checkmark নী+আ=নেওয়া (ই স্থলে এ); ’ \checkmark ধু+আ =ধোয়া (উ স্থলে ও) ; কৃ+তা = করতা> কর্তা (ঝ স্থলে অৱ)।
২. বৃদ্ধি : (ক) অ-স্থলে আ, (খ) ই ও ই-স্থলে ঐ, (গ) উ ও উ স্থলে ও এবং (ঘ) ঝ-স্থলে আৱ হয়। যেমন - পচ + অ (গক) = পাচক (পচ-এর অ স্থলে ‘আ’); শিশু+ অ(ষ্ট) = শৈশব (ই স্থলে ঐ); যুব+ অন= যৌবন (উ স্থলে ও); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (ঝ স্থলে আৱ)।

বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

১. (০) শূন্য-প্রত্যয় : কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন - এ মোকদ্দমায় তোমার জিত্ হবে না, হার-ই হবে। গ্রামে খুব ধরু পাকড় চলছে।
২. অ-প্রত্যয় : কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - \checkmark ধৰ+ অ=ধৰ, \checkmark মার +অ=মার। আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন - \checkmark হার + অ=হার, \checkmark জিত+ অ = জিত।

কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়ুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ হয়। যেমন - (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিতীয়প্রাপ্ত) $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অ} = \text{কাদকাদ}$ (চেহারা)। এরূপ - $\sqrt{\text{পড়}} + \text{অ} = \text{পড়পড়}$, $\sqrt{\text{মর}} + \text{অ} = \text{মরমর}$ (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো কখনো দ্বিতীয়প্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ-প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{উ} = \text{ডুবডুবু}$ । $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উ} = \text{উড়উড়ু}$ ।

৩. অন-প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ‘অন’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অন} = \text{কাদন}$ (কান্নার ভাব)। এরূপ - নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

বিশেষ নিয়ম

(ক) আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে অন্য স্থলে ‘ওন’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{খা}} + \text{অন} = \text{খাওন}$, $\sqrt{\text{ছা}} + \text{অন} = \text{ছাওন}$, $\sqrt{\text{দে}} + \text{অন} = \text{দেওন}$ ।

(খ) আ-কারান্ত প্রযোজক (গিজন্ত) ধাতুর পরে ‘আন’ প্রত্যয় যুক্ত হলে ‘আনো’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{জানা}} + \text{আন} = \text{জানানো}$ । এরূপ - শোনানো, ভাসানো।

৪. অনা-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অনা} = \text{দুলনা}$ । $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$ ।

৫. অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চিরি}} + \text{অনি} = \text{চিরনি}$ । $\sqrt{\text{বাঁধ}} + \text{অনি} = \text{বাঁধনি} > \text{বাঁধুনি}$ । $\sqrt{\text{আঁটি}} + \text{অনি} = \text{আঁটনি}$ । আঁটুনি ।

৬. অন্ত-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘অন্ত’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{উড়}} + \text{অন্ত} = \text{উড়ন্ত}$, $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{অন্ত} = \text{ডুবন্ত}$ ।

৭. অক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মুড়}} + \text{অক} = \text{মোড়ক}$ । $\sqrt{\text{বল}} + \text{অক} = \text{বলক}$ ।

৮. আ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘আ’ প্রত্যয় হয়। যেমন $\sqrt{\text{পড়}} + \text{আ} = \text{পড়া}$ (পড়া বই)। এরূপ রাঁধ (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

৯. আই-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আই’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন - চড়ু + আই = চড়াই
সিল + আই = সিলাই > সেলাই

১০. আও-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আও’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পাকড়}} + \text{আও} = \text{পাকড়াও}$,
 $\sqrt{\text{চড়}} + \text{আও} = \text{চড়াও}$ ।

১১. আন (আনো) প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে ‘আন/আনো’ প্রত্যয় হয়।
যেমন - $\sqrt{\text{চাল}} + \text{আন} = \text{চালান}/\text{চালানো}$ । $\sqrt{\text{মান}} + \text{আন} = \text{মানান}/\text{মানানো}$ ।

১২. অনি-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{জান}} + \text{অনি} = \text{জানানি}$, $\sqrt{\text{শুন}} + \text{অনি} = \text{শুনানি}$,
 $\sqrt{\text{উড়}} + \text{অনি} = \text{উড়ানি}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উনি} = \text{উড়ুনি}$ ।

১৩. আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি-প্রত্যয় : যেমন - $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{আরি}$ / উরি = ডুবুরী। এরূপ - ধূনারী, পূজারী
ইত্যাদি

১৪. আল-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মাত্}} + \text{আল} = \text{মাতাল}$, $\sqrt{\text{মিশ্}} + \text{আল} = \text{মিশাল}$ ।

১৫. ই-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘ই’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা - $\sqrt{\text{ভাজ}} + \text{ই} = \text{ভাজি}$, $\sqrt{\text{বেড়}} + \text{ই} = \text{বেড়ি}$ ।

১৬. ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{মর}} + \text{ইয়া} = \text{মরিয়া}$
(মরতে প্রস্তুত), $\sqrt{\text{বল}} + \text{ইয়ে} = \text{বলিয়ে}$ (বাকপটু)। এরূপ - নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে
ইত্যাদি।

১৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা - $\sqrt{\text{ডাক}} + \text{উ} = \text{ডাকু}$, $\sqrt{\text{বাড়}} + \text{উ} = \text{বাডু}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উ} = \text{উডু}$ (ঘিত্ব উডুউডু)
১৮. ‘উয়া’ বিকল্পে ‘ও’ – প্রত্যয় : বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে ‘উয়া’ এবং ‘ও’ প্রত্যয় হয়। যথা - $\sqrt{\text{পড়}} + \text{উয়া} = \text{পডুয়া} > \text{পড়ো}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উয়া} = \text{উডুয়া} > \text{উড়ো}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{ও} + \text{উড়ো} = \text{চিঠি}$ ।
১৯. তা-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘তা’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ফিরি}} + \text{তা} = \text{ফিরতা}$ ফেরতা, $\sqrt{\text{পড়}} + \text{তা} = \text{পড়তা}$, $\sqrt{\text{বহু}} + \text{তা} = \text{বহতা}$ ।
২০. তি-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ঘাটি}} + \text{তি} = \text{ঘাটতি}$, $\sqrt{\text{বাড়ি}} + \text{তি} = \text{বাড়তি}$ । এরূপ - কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।
২১. না-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘না’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{কান্দি}} + \text{না} = \text{কান্দনা} > \text{কান্না}$, $\sqrt{\text{রাখি}} + \text{না} = \text{রাখনা}$ । এরূপ - বারনা ইত্যাদি।

কৃ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. অনট-প্রত্যয় : ('ট' ইঁ (বিলুপ্ত) হয়, 'অন' থাকে) : $\sqrt{\text{নী}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{নী}} + \text{অন} > \text{নে} + \text{অন}$ (গুণসূত্রে) = নয়ন, $\sqrt{\text{শু}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{শু}} + \text{অন}$ (গুণ ও সম্বিধির ফলে) = শ্রবণ। এরূপ - স্থান, ভোজন, নর্তন, দর্শন ইত্যাদি।
২. ক্ত-প্রত্যয় ('ক' ইঁ 'ত' থাকে) : $\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{ক্ত} = \text{জ্ঞাত}$, $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{ক্ত} = \text{খ্যাত}$ ।

বিশেষ নিয়ম

- (ক) ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যম্বর ‘ই’ কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পঠি}} + \text{ক্ত} = (\text{পঠ} + \text{ই} + \text{ত}) = \text{পঠিত}$ । এরূপ - গিধিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত, পতিত, লুঁষিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।
- (খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত ‘চ’ ও ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{সিচি}} + \text{ক্ত} = (\text{সিক} + \text{ত})$ সিক্ত। এরূপ - $\sqrt{\text{মুচি}} + \text{ক্ত} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভুজি}} + \text{ক্ত} = \text{ভুক্তি}$ ।

- (গ) এ ছাড়া ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন - $\sqrt{\text{গমি}} + \text{ক্ত} = \text{গত}$, $\sqrt{\text{গ্রন্থি}} + \text{ক্ত} = \text{গ্রথিত}$, $\sqrt{\text{চুরি}} + \text{ক্ত} = \text{চূর্ণ}$, $\sqrt{\text{ছিদ্}} + \text{ক্ত} = \text{ছিল্লি}$, $\sqrt{\text{জনি}} + \text{ক্ত} = \text{জাত}$, $\sqrt{\text{দা}} + \text{ক্ত} = \text{দত্ত}$, $\sqrt{\text{দহি}} + \text{ক্ত} = \text{দগ্ধ}$, $\sqrt{\text{বচি}} + \text{ক্ত} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{বপি}} + \text{ক্ত} = \text{উপ্তি}$, $\sqrt{\text{মুহি}} + \text{ক্ত} = \text{মুগ্ধ}$, $\sqrt{\text{মুধি}} + \text{ক্ত} = \text{মুদ্ধি}$, $\sqrt{\text{লভি}} + \text{ক্ত} = \text{লত্তি}$, $\sqrt{\text{ব্রহ্মি}} + \text{ক্ত} = \text{সূপ্তি}$, $\sqrt{\text{সৃজি}} + \text{ক্ত} = \text{সৃষ্টি}$, $\sqrt{\text{হনি}} + \text{ক্ত} = \text{হত ইত্যাদি}$ ।

৩. ক্তি-প্রত্যয় ('ক' ইঁ 'তি' থাকে) : $\sqrt{\text{গমি}} + \text{ক্তি} = \sqrt{\text{গমি}} + \text{তি} = \text{গতি}$ (এখানে ‘ম’ লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

- (ক) ক্তি-প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা - $\sqrt{\text{মনি}} + \text{ক্তি} = \text{মতি}$, $\sqrt{\text{রমি}} + \text{ক্তি} = \text{রতি}$ ।
- (খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ-কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{শ্রমি}} + \text{ক্তি} = \text{শ্রান্তি}$ (সম্বিধিসূত্রে ম>ন), $\sqrt{\text{শয়ি}} + \text{ক্তি} = \text{শান্তি}$ ।
- (গ) ‘চ’ এবং ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{বচি}} + \text{ক্তি} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{মুচি}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভজি}} + \text{ক্তি} = \text{ভক্তি}$ ।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : $\sqrt{\text{গৈ}+\text{ক্তি}}=\text{গীতি}$, $\sqrt{\text{সিদ্ধ}+\text{ক্তি}}=\text{সিদ্ধি}$, $\sqrt{\text{বুধ}+\text{ক্তি}}=\text{বৃদ্ধি}$, $\sqrt{\text{শক}+\text{ক্তি}}=\text{শক্তি}$ ।

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : $\sqrt{\text{কৃ}+\text{তব্য}}=\text{কর্তব্য}$, $\sqrt{\text{দা}+\text{তব্য}}=\text{দাতব্য}$, $\sqrt{\text{পঠ}+\text{তব্য}}=\text{পঠিতব্য}$ ।

(খ) অনীয় : $\sqrt{\text{কৃ}+\text{অনীয়}}=\text{করণীয়}$, $\sqrt{\text{রক্ষ}+\text{অনীয়}}=\text{রক্ষণীয়}$ । এরূপ-দর্শনীয়, পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।

৫. তৃচ-প্রত্যয় ('চ' ইঁ 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন-
 $\sqrt{\text{দা}+\text{তৃ}}=\sqrt{\text{দা}+\text{ত}}=\sqrt{\text{দা}+\text{তা}}$ = দাতা $\sqrt{\text{মা}+\text{তৃ}}=\text{মাতা}$, $\sqrt{\text{ক্রী}+\text{তৃ}}=\text{ক্রেতা}$ ।

বিশেষ নিয়মে : $\sqrt{\text{যুধ}+\text{তৃ}}=\sqrt{\text{যুধ}+\text{তা}}=\text{যোদ্ধা}$ ।

৬. ণক-প্রত্যয় ('ণ' ইঁ 'অক' থাকে) : $\sqrt{\text{পঠ}+\text{ণক}}=\sqrt{\text{পঠ}+\text{অক}}=\text{পাঠক}$ । মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন- $\sqrt{\text{নী}+\text{ণক}}=(\text{নৈ}+\text{অক}-\text{প্রথম স্বরের বৃদ্ধি})$ নায়ক, $\sqrt{\text{গৈ}+\text{ণক}}=\text{গায়ক}$, $\sqrt{\text{লিখ}+\text{ণক}}=\text{লেখক}$ ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ণক-প্রত্যয় পরে থাকলে গিজন্ত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{গুজি}+\text{ণক}}=\text{গুজক}$ । এরূপ-জনক, চালক, স্তাবক।

(খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যথা- $\sqrt{\text{দা}+\text{ণক}}=\text{দায়ক}$, বি- $\sqrt{\text{ধা}+\text{ণক}}=\text{বিধায়ক}$ ।

৭. ঘ্যণ-প্রত্যয় [ঘ, ণ-ইঁ, য (য-ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ হয়। যথা- $\sqrt{\text{কৃ}+\text{ঘ্যণ}}=\text{কার্য্য}$, $\sqrt{\text{ধূ}+\text{ঘ্যণ}}=\text{ধার্য্য}$ । এরূপ - পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।

(দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলা বানানে $\text{রেফ}+\text{য}+\text{য}=ৰ্য্য$ হয় না, $ৰ্য্য$ হয়।)

৮. য-প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও উচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ-কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন - $\sqrt{\text{দা}+\text{য}}=\text{দায়}=$ $\text{দেয়}=$ $\text{য়}=$ $\sqrt{\text{হা}+\text{য}}=\text{হেয়}$ ।

এরূপ - বিধেয়, অজেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর 'য' প্রত্যয় স্থলে য-ফলা হয়। যথা- $\sqrt{\text{গম}+\text{য}}=\text{গম্য}$, $\sqrt{\text{লভ}+\text{য}}=\text{লভ্য}$ ।

৯. গিন-প্রত্যয় (ণ ইঁ, ইণ্ থাকে, ইন্ 'ঈ'-কার হয়) : $\sqrt{\text{গ্রহ}+\text{গিন}}=\text{গাহী}$, $\sqrt{\text{পা}+\text{গিন}}=\text{পায়ী}$ । এরূপ-কাহী, দোহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থায়ী, গামী। কিন্তু 'গিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা - আআ- $\sqrt{\text{হণ}+\text{গিন}}=\text{আঘাতী}$ ।

১০. ইন্ প্রত্যয় (ইন)=ঈ-কার হয়) : $\sqrt{\text{শ্রম}+\text{ইন}}=\text{শ্রমী}$ ।

১১. অল-প্রত্যয় (ল ইঁ, অ থাকে) : $\sqrt{\text{জি}+\text{অল}}=\text{জয়}$, $\sqrt{\text{ক্ষি}+\text{অল}}=\text{ক্ষয়}$ । এরূপ-তয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : $\sqrt{\text{হণ}+\text{অল}}=\text{বধ}$ ।

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ-প্রত্যয়

১. ইষ্টু-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চল}+\text{ইষ্টু}}=\text{চলিষ্টু}$ । এরূপ - ক্ষয়িষ্টু, বর্ধিষ্টু।

২. বর-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ঈশ}+\text{বর}}=\text{ঈশ্বর}$, $\sqrt{\text{ভাস}+\text{বর}}=\text{ভাস্বর}$ । এরূপ-নশ্বর, স্থাবর।

৩. র-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{হিন}+\text{স}+\text{র}}=\text{হিস্তু}$, $\sqrt{\text{নম}+\text{র}}=\text{নম্বৰ}$ ।

৪. উক/উক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ভু}}+\text{উক}=(\text{ভো}+\text{উক})=\text{ভাবুক}$, $\text{জাগ}+\text{উক}=(\text{জাগর}+\text{উক})\text{ জাগুক}$ ।
৫. শানচ-প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইঁ, 'আন' বিকলে 'মান' থাকে) : $\sqrt{\text{দীপ}}+\text{শানচ}=\text{দীপ্যমান}$ । এরূপ -
 $\sqrt{\text{চল}}+\text{শানচ}=\text{চলমান}$, $\sqrt{\text{বৃথ}}+\text{শানচ}=\text{বর্ধমান}$ ।
৬. ঘএও-প্রত্যয় [(কৃদন্ত বিশেষ গঠনে), ঘ এবং এও ইঁ, 'অ' থাকে] : $\sqrt{\text{বস}}+\text{ঘএও}=\text{বাস}$, $\sqrt{\text{যুজ}}+\text{ঘএও}=$
 যোগ, $\sqrt{\text{কুধ}}+\text{ঘএও}=\text{ক্রোধ}$, $\sqrt{\text{খুদ}}+\text{ঘএও}=\text{খেদ}$, $\sqrt{\text{ভিদ}}+\text{ঘএও}=\text{ভেদ}$ ।
- বিশেষ নিয়ম : $\sqrt{\text{ত্যজ}}+\text{ঘএও}=\text{ত্যাগ}$, $\sqrt{\text{পচ}}+\text{ঘএও}=\text{পাক}$, $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘএও}=\text{শোক}$ ।
 কিন্তু, $\sqrt{\text{নন্দি}}+\text{অন}=\text{নন্দন}$ । এক্ষেত্রে আ মোগে 'নন্দনা' হয় না।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু ও ক্রিয়া প্রকৃতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুবিয়ে দাও।
- ২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর
 (ক) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে-----।
 (খ) কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত পদটিকে বলা হয়-----।
- ৩। গুণ ও বৃদ্ধি বলতে কী বোঝা?
- ৪। নিচের প্রত্যয়গুলোর কোনটি 'ইঁ' হয় লেখ।
 অন্ট, আন, শানচ, তৃচ, শিল, ঘএও, ঘ্যণ, ক্ষি, ক্ষত
 নিচের কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। $\sqrt{\text{পঠ}}+\text{ক্ষি}=\text{পঠিত}$, $\sqrt{\text{শম}}+\text{ক্ষি}=\text{শান্তি}$,
 $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘএও}=\text{শোক}$, $\sqrt{\text{নী}}+\text{তৃচ}=\text{নেতা}$
- ৫। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।
 নাচুনে, ঝরনা, নিবুনিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, বুদ্ধ, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক,
 জাগুক
- ৬। ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 জমানো, ডরানো, হাঁকানো, লটকানো, ঝরনা
- ৭। যৌটি ঠিক তার ডানে টিক (।) চিহ্ন দাও
 ক. ক্রিয়ামূলকে/ ক্রিয়ার কালকে/ক্রিয়াপদকে/ অক্রিয়াবাচক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপ্রকৃতি।
 খ. কৃদন্তপদকে / ক্রিয়াপদকে/ক্রিয়া বিশেষণকে/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি
 যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।
 গ. কৃৎ প্রত্যয়হীন পদকে/ কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে , ক্রিয়ামূলকে বলা হয় কৃদন্তপদ।
- ৮। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 ঘাটতি, ঝলক, ঝাঁধুনি, ঝাড়ু, দর্শন, মুক্ত, মুগ্ধ, উপ্ত, ভোজ্য, জয়

দশম পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক প্রত্যয়

১. ছেলেটি বড় লাজুক।

২. বড়াই করা ভালো না।

৩. ঘরামি ডেকে ঘর ছেয়ে নে।

ওপরের ‘লাজুক’, ‘বড়াই’ শব্দগুলো গঠিত হয়েছে এভাবে : লাজুক= লাজ + উক; বড়াই=বড়+আই; ঘরামি = ঘর+আমি। ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’ শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে ‘উক’, ‘আই’ ও ‘আমি’ (প্রত্যয়) যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যেসব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তান্ত্রিক প্রত্যয় বলা হয়।

দ্রষ্টব্য : ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’— এ শব্দগুলোর সাথে কোনো শব্দ/বিভক্তি যুক্ত হয় নি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক তান্ত্রিক প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতিও বলা হয়।

ধাতু যেমন কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তান্ত্রিক প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় নাম প্রকৃতি।

তান্ত্রিক প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় তান্ত্রিক প্রত্যয় তিনি প্রকার।

ক. বাংলা তান্ত্রিক প্রত্যয়

খ. বিদেশি তান্ত্রিক প্রত্যয়।

গ. তৎসম বা সংস্কৃত তান্ত্রিক প্রত্যয়।

(ক) বাংলা তান্ত্রিক প্রত্যয়

১. আ-প্রত্যয়

(ক) অবজ্ঞার্থে : চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্টা।

(খ) বৃহদার্থে : ডিঙি + আ= ডিঙা (সম্পত্তিঙ্গ মধুকর)।

(গ) সদৃশ অর্থে : বাঘ+আ=বাঘা, হাত + আ=হাতা। এরূপ : কাল –কালা (চিকন কালা), কান–কানা।

(ঘ) ‘তাতে আছে’ বা ‘তার আছে’ অর্থে : জল + আ=জলা, গোদ + আ=গোদা। এরূপ : রোগ –রোগা, চাল– চালা, শুন–শুনা।

(ঙ) সমষ্টি অর্থে : বিশ –বিশা, বাইশ–বাইশা (মাসের বাইশা) > বাইশে।

(চ) স্বার্থে : জট+আ=জটা, চোখ–চোখা, চাক–চাকা।

(ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজির –হাজিরা, চাষ–চাষা।

(জ) জাত ও আগত অর্থে : মহিষ>ভইস–ভয়সা (ঘি), দখিন–দখিনা> দখনে (হাওয়া)।

২. আই-প্রত্যয়

- (ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড়+আই=বড়ই, চড়া +আই=চড়াই।
- (খ) আদরার্থে : কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই।
- (গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে : বোন+আই= বোনাই, নন্দ-নন্দাই, জেঠা-জেঠাই (মা)।
- (ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে : মিঠা +আই=মিঠাই।
- (ঙ) জাত অর্থে : ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি), পাবনা-পাবনাই (শাড়ি)।
- (চ) বিশেষণ গঠনে : চোর-চোরাই (মাল), মোগল-মোগলাই (পরোটা)।

৩. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : ইতর+আমি =ইতরামি, পাগল+আমি = পাগলামি, চোর+আমি =চোরামি,
বাঁদর+আমি =বাঁদরামি, ফাঙ্গিল +আমো=ফাঙ্গলামো।
- (খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে : ঠক+আমো=ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর+আমি=ঘরামি।
- (গ) নিষ্ঠা জ্ঞাপন : জেঠা+আমি=জেঠামি, ছেলে+আমি=ছেলেমি।

৪. ই/ঈ-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর +ই = বাহাদুরি, উমেদার-উমেদারি।
- (খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে : ডাক্তার-ডাক্তারি, মোক্তার-মোক্তারি, পোদ্দার-পোদ্দারি, ব্যাপার-ব্যাপারি, চাষ-চাষি।
- (গ) মালিক অর্থে : জমিদার-জমিদারি, দোকান-দোকানি।
- (ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে : ভাগলপুর-ভাগলপুরি, মদ্রাজ-মদ্রাজি, রেশম-রেশমি,
সরকার-সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।

৫. ইয়া > এ-প্রত্যয়

- (ক) তৎকালীনতা বোঝাতে : সেকাল + এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদুর +ইয়া = ভাদুরিয়া >
ভাদুরে (কইমাছ)।
- (খ) উপকরণ বোঝাতে : পাথর –পাথরিয়া > পাথুরে, মাটি –মেটে, বালি- বেলে।
- (গ) উপজীবিকা অর্থে : জাল-জালিয়া >জেলে, মোট-মুটে।
- (ঘ) নৈপুণ্য বোঝাতে : খুন-খুনিয়া > খুনে, দেমাক-দেমাকে, না (নৌকা) – নাইয়া > নেয়ে।
- (ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে : টন্টন- টন্টনে (জ্ঞান), কনকন -কনকনে (শীত), গনগন -গনগনে
(আগুন), চকচক- চকচকে (ভূতা)।

৬. উয়া > ও-প্রত্যয়

- (ক) রোগঘস্ত অর্থে : জ্বর+উয়া = জ্বরুয়া>জ্বরো। বাত+উয়া=বাতুয়া> বেতো (ঘোড়া)।
- (খ) যুক্ত অর্থে : টাক – টেকো।
- (গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে : খড়–খড়ো (খড়োঘর)।
- (ঘ) জাত অর্থে : ধান–ধেনো।
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে : মাঠ–মেঠো, গৌ–গাইয়া> গৌয়ো।
- (চ) উপজীবিকা অর্থে : মাছ–মাছুয়া> মেছো।
- (ছ) বিশেষণ গঠনে : দাঁত–দেঁতো (হাসি), হাঁদ–হেঁদো (কথা), তেল–তেলো> তেলা (মাথা), কুঁজ–কুঁজো (লোক)।

৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : ঢাল + উ = ঢালু, কল+উ=কলু।

৮. উক-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : লাজ–লাজুক, মিশ–মিশুক, মিথ্যা–মিথ্যুক।

৯. আরি/আরী/আৱু-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : ভিখ–ভিখারি, শাখ–শাখারি, বোমা–বোমারু।

১০. আশি/আগো/আশি/আশী>এশ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে : দাঁত–দাঁতাল, লাঠি–লাঠিয়াল> লেঠেল, তেজ–তেজাল, ধার–ধারাল, শাস–শাসাল, জমক–জমকালো, দুধ–দুধাল> দুধেল, হিম–হিমেল, চতুর– চতুরালি, ঘটক– ঘটকালি, সিঁদ–সিঁদেল, গীজা–গীজেল।

১১. উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয় : হাট–হাটুরিয়া> হাটুরে, সাপ–সাপুড়িয়া>সাপুড়ে, কাঠ–কাঠুরে।

১২. উড়-প্রত্যয় : অর্থহীনভাবে : লেজ–লেজুড়।

১৩. উয়া/ওয়া>ও-প্রত্যয় : সম্পর্কিত অর্থে : ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল+ উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)।

১৪. আটিয়া / টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তামা–তামাটিয়া> তামাটে, ঝগড়া–ঝগড়াটে, ভাড়া–ভাড়াটে, রোগা–রোগাটে।

১৫. অট>ট-প্রত্যয় : স্বার্থে : ভরা – ভরাট, জমা–জমাট।

১৬. শা-প্রত্যয় : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ–মেঘলা

(খ) স্বার্থে : এক–একলা, আধ–আধলা।

(খ) বিদেশি ভাষ্যিত প্রত্যয়

১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি) : বাড়ি–বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি–দিল্লিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে), মাছ–মাছওয়ালা (বৃক্ষি অর্থে), দুধ–দুধওয়ালা (বৃক্ষি অর্থে)।
২. ওয়ান>আন (হিন্দি) : গাড়ি–গাড়োয়ান, দার –দারোয়ান।
৩. আনা>আনি (হিন্দি) : মুনশি–মুনশিয়ানা, বিবি–বিবিআনা, হিন্দু–হিন্দুয়ানি।

৮. সা (হিন্দি) : পানি—পানসা > পানসে, এক—একসা, কাল (কাল)—কালসা > কালসে।
৫. গর > কর (ফারসি) : কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।
৬. দার (ফারসি) : তাঁবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।
৭. বাজ (দক্ষ অর্থে—ফারসি) : কলমবাজ, ধড়িবাজ, ধোকাবাজ, গলাবাজ+ই=গলাবাজি (বিশেষ)।
৮. বন্দি (বন্দ—ফারসি) : জবানবন্দি, সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ।
৯. সই : মতো অর্থে : জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।
১০. পনা : মতো অর্থে : গিন্নীপনা, বেহায়াপনা।

দ্রষ্টব্য : ‘টিপসই’ ও ‘নামসই’ শব্দ দুটোর ‘সই’ প্রত্যয় নয়। এটি ‘সহি’ (অর্থ—স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

(গ) সংস্কৃত তান্ত্রিক প্রত্যয়

ঝ, ঝি, ঝও, ঝিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ইন, তর, তম, তা, ত্, নীন, নীয়, বতুপ্, বিন্, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তান্ত্রিক প্রত্যয়যোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এখানে কতগুলো সংস্কৃত তান্ত্রিক প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো।

কয়েকটি সাধারণ সূত্র

১. যে শব্দের সঙ্গে ঝও (অ)—প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা— নগর+ঝও=নাগর, মধুর +ঝও=মাধুর্য।

বৃদ্ধি : (১) অ—স্থানে আ, (২) ই, ঈ—স্থানে ঐ, (৩) উ, উ—স্থানে ঔ এবং (৪) ঝ—স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

২. যে শব্দের সঙ্গে ঝও (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ—কারও ও—কারে পরিণত হয়। ও+অ সম্মিলিতে ‘অব’ হয়। যথা—গুরু+ঝও=গৌরব, লঘু+ঝও =লাঘব, শিশু +ঝও=শৈশব, মধু +ঝও=মাধব, মনু +ঝও=মানব।

৩. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তান্ত্রিক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—

পরলোক + ঝিক = পারলোকিক।

সুভগ্ন+ঝও=সৌভগ্ন্য।

পঞ্চভূত+ঝিক=পাঞ্চভৌতিক।

সর্বভূমি+ঝও=সার্বভৌম।

ব্যতিক্রম : ‘বর্ষ’ শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা—দিবর্ষ +ঝিক= দিবাৰ্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন—বর্ষ + ঝিক=বাৰ্ষিক।

৪. ‘য’ প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ—এর লোপ হয়। যথা— সম্য+য =সাম্য, কবি+য =কাব্য, মধুর +য =মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য।

ব্যতিক্রম : সভা+য=সভ্য (‘সাভ্য’ নয়)।

কয়েকটি সহস্রত তদ্ধিত প্রত্যয়

১. ইত-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

কুসুম + ইত=কুসুমিত, তরঙ্গ+ইত=তরঙ্গিত, কণ্টক+ইত=কণ্টকিত।

২. ইমন-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

নীল+ইমন=নীলিমা। মহৎ+ইমন=মহিমা।

৩. ইল-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল, উর্মি +ইল =উর্মিল, ফেন+ইল=ফেনিল।

৪. ইষ্ট-প্রত্যয় : অতিশায়নে

গুরু+ইষ্ট=গরিষ্ঠ, লম্বু+ইষ্ট=লধিষ্ঠ।

৫. ইন् (ঈ)-প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে

জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্	সুখ+ইন্=সুখিন্।
------------------------	-----------------

গুণ+ইন্=গুণিন্	মান+ইন্=মানিন্।
----------------	-----------------

সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্য লোপ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন ইত্যাদি।

কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন-

জ্ঞান+ইন্ (ঈ) – জ্ঞানী, গুণ+ ইন্বৈ গুণী ইত্যাদি।

স্ত্রী লিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ-যুক্ত হয়ে ইনী রূপ গ্রহণ করে। যেমন-

জ্ঞান+ইনী-জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী =গুণিনী ইত্যাদি।

৬. তা ও ত্ব-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

বন্ধু+ তা =বন্ধুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা।

বন্ধু+ত্ব=বন্ধুত্ব, গুরু+ত্ব = গুরুত্ব।

ঘন+ত্ব=ঘনত্ব, মহৎ+ত্ব = মহত্ব।

৭. তর ও তম-প্রত্যয় : অতিশায়নে

মধুর-মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়-প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. নীন (দ্বিন)- প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে

সর্বজন+নীন=সর্বজনীন, কুল+নীন =কুলীন, নব+নীন=নবীন।

৯. নীয় (দ্বিয়)- প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

জল+নীয় =জলীয়, বায়ু+নীয় =বায়বীয়, বর্ষ+নীয় =বর্ষীয়।

বিশেষ নিয়মে : পর-পরকীয়, স্ব-স্বকীয়, রাজা-রাজকীয়।

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে ‘বাল এবং ‘মাল’ হয়] : বিশেষণ গঠনে
গুণ+বতুপ্=গুণবান, দয়া+বতুপ্ = দয়াবান।

শ্রী+মতুপ্=শ্রীমান, বৃদ্ধি+মতুপ্=বৃদ্ধিমান।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা+বিন्=মেধাবী, মায়া+বিন্ = মায়াবী, তেজঃ+বিন্= তেজস্বী, যশঃ +বিন্=যশস্বী।

১২. র-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু+র=মধুর, মুখ+র=মুখর।

১৩. ল-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

শীত +ল = শীতল, বৎস +ল= বৎসল।

১৪. ষষ্ঠি (অ) প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ষষ্ঠি =মানব, যদু +ষষ্ঠি=যাদব।

(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ ষষ্ঠি= শৈব, জিন+ষষ্ঠি=জৈন। এরূপ : শক্তি-শাক্ত, বুদ্ধ-বৌদ্ধ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থে : শিশু +ষষ্ঠি = শৈশব, গুরু+ষষ্ঠি =গৌরব, কিশোর+ষষ্ঠি=কৈশোর।

(ঘ) সম্মর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ ষষ্ঠি = পার্থিব, দেব+ষষ্ঠি=দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ষষ্ঠি=চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষষ্ঠি=সৌর (সাধারণ নিয়মে সূর+ষষ্ঠি (অ)=সৌর)।

১৫. ষষ্ঠি (ঘ) প্রত্যয়

(ক) অপত্যার্থে : মনুঃ +ষষ্ঠি=মনুষ্য, জমদগ্নি+ষষ্ঠি=জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ষষ্ঠি=সৌন্দর্য, শুরু+ষষ্ঠি=শৌর্য। ধীর+ষষ্ঠি=ধৈর্য, কুমার +ষষ্ঠি =কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ষষ্ঠি = পার্বত্য, বেদ+ষষ্ঠি =বৈদ্য।

১৬. ষষ্ঠি (ই)-প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ+ষষ্ঠি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষষ্ঠি=দাশরথি।

১৭. ষষ্ঠি (ইক)-প্রত্যয়

(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য +ষষ্ঠিক=সাহিত্যিক, বেদ+ষষ্ঠিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ষষ্ঠিক=বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থে : সমুদ্র+ষষ্ঠিক=সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক, মাস -মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর-সামরিক, সমাজ-সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ষষ্ঠিক=হেমন্তিক, অকস্মাৎ+ষষ্ঠিক=আকস্মিক।

১৮. ষেওয় (এয়)-প্রত্যয়

ভগিনী+ষেওয়=ভাগিনেয়, অগ্নি+ষেওয়=আগ্নেয়, বিমাত্ (বিমাতা) +ষেওয়=বৈমাত্রেয়।

অনুশীলনী

- ১। তদ্বিত প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? তদ্বিত প্রত্যয়কে শব্দ প্রত্যয় বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ২। প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতি বলা হয় কেন?
- ৩। নিম্নলিখিত খাঁটি বাংলা তদ্বিতান্ত শব্দসমূহে কী অর্থে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

হাজিরা	-	জলা	-	মিঠাই	-	গেজুড়	-	চামচা	-
দরকারি	-	টেকো	-	মিথুক	-	ঘরোয়া	-	ঢাকাই	-

৪। দুটি করে উদাহরণ দাও।

- (ক) ষণ্ঠি (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির (প্রাতিপদিকের) স্বরের বৃদ্ধি হয়।
- (খ) ষণ্ঠি প্রত্যয় যুক্ত হলে মূলস্বরের বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উ-কার থাকলে তা ও-কার হয়।
- (গ) তদ্বিতান্ত শব্দের প্রকৃতি দুটি শব্দে গঠিত হলে অথবা শব্দটি উপসর্গযুক্ত থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই (উপসর্গসহ) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কাব্য, ভাগিনৈয়, বৈজ্ঞানিক, বায়বীয়, সর্বজনীন, সুখী, কুসুমিত, ফেনিল, শীতল, মধুর, কুলীন, পার্বত্য, বৌদ্ধ, সূর্য, পৌরুষ, মেধাবী।

৬. ঠিক উত্তরাচিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- ক. প্রাতিপদিক বলা হয়- বিভক্তিযুক্ত পদকে / সমস্যমান পদকে/ বিভক্তিহীন পদকে।
- খ. বাংলা ভাষায় তদ্বিত প্রত্যয় - দুই প্রকার / তিন প্রকার / চার প্রকার
- গ. ওয়ালা (দুখওয়ালা) - বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়
- ঘ. উড় (লেজুড়) - বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়
- ঙ. ইত (কুসুমিত) বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত
২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) বৃঢ়ি এবং (গ) যোগবৃঢ়ি
৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তত্ত্ব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা তেওঁে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গোলাপ, নাক, লাল, তিনি।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুরুরি (ডুব+উরি), চলন্ত (চল + অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিনি ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. যৌগিক শব্দ

খ. বৃঢ়ি বা বৃঢ়ি শব্দ

গ. যোগবৃঢ়ি শব্দ

ক. **যৌগিক শব্দ** : যে সকল শব্দের বৃংপন্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন-

গায়ক = গৈ + ক (অক) – অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র – অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র = দুহিতা+ষণ্য – অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা – অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

খ. **বৃঢ়ি শব্দ** : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে বৃঢ়ি শব্দ বলে। যেমন—হস্তী=হস্ত + ইন, অর্থ-হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ – গৱু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এ রকম-

ঁাশি - বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

তেল - শুধু তিলজাত মেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উচ্চিজ্জ পদার্থজাত মেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন-
বাদাম-তেল।

প্রবীণ - শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি ‘অভিজ্ঞতাসম্মত
বয়স্ক ব্যক্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সন্দেশ - শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে ‘সংবাদ’। কিন্তু রূটি অর্থে ‘মিষ্টান্ন বিশেষ’।

গ. **যোগরূচি শব্দ** : সমাস নিষ্ঠান্ত যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো
বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূচি শব্দ বলে। যেমন-

পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধি উচ্চিদ পঙ্কে জন্মে
থাকে। কিন্তু ‘পঙ্কজ’ শব্দটি একমাত্র ‘পদ্মফুল’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূচি শব্দ।

রাজপুত - ‘রাজার পুত্র’ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে ‘জাতিবিশেষ’।

মহাযাত্রা - মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দরূপে অর্থ ‘মৃত্যু’।

জলধি - ‘জল ধারণ করে এমন’ অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র ‘সমুদ্র’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

৩. **উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ** : বাংলা ভাষা অধ্যায়ে বাংলা ভাষার শব্দভাড়ার পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদ
আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে। বিভাগগুলোর নাম লেখ।

২। অর্থগতভাবে বা অর্থের বিচার-বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে, উদাহরণসহ
উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ রূটি, যোগরূচি ও যৌগিক-এই তিনিটি গুচ্ছে প্রদত্ত ছক অনুসারে সাজাও।

তাগিনেয়, জলধি, রাজপুত, রাজপুত্র, বাঁশি, তেল, সন্দেশ।

রূটি	যোগরূচি	যৌগিক শব্দ

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যৃৎপত্রিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ লেখ।

ক) সন্দেশ খ) হরিণ গ) প্রবীণ ঘ) মহাযাত্রা

৫। নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন শ্রেণিতে পড়ে নেখ।

নীলিমা, এক, জনৈক, হাত, ছেলেধরা, সাপ, আসমান-জমিন, বেহায়াপনা, সাপুড়িয়া, হাত-পা,
লাজুক, সাথবাদিক, পাগলামি, বাঢ়িওয়ালা, চা বাগান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদ-প্রকরণ

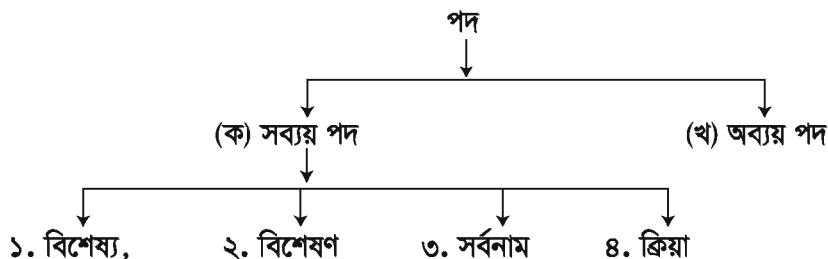
দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য টাঁদের দেশে পৌছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওপরের বাক্যটিতে ‘রা’ (অভিযাত্রী + রা), ‘এর’ (মানুষ + এর), ‘র’ (কল্পনা + র), ‘এ’ (মঙ্গলগ্রহ + এ) প্রত্তি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।



আলোচ্য বাক্যটিতে

- | | |
|---------------|---|
| ১. বিশেষ্য পদ | : অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ |
| ২. বিশেষণ পদ | : দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত |
| ৩. সর্বনাম পদ | : তাঁরা |
| ৪. ক্রিয়াপদ | : পৌছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া) |
| ৫. অব্যয় পদ | : এবং, জন্য |

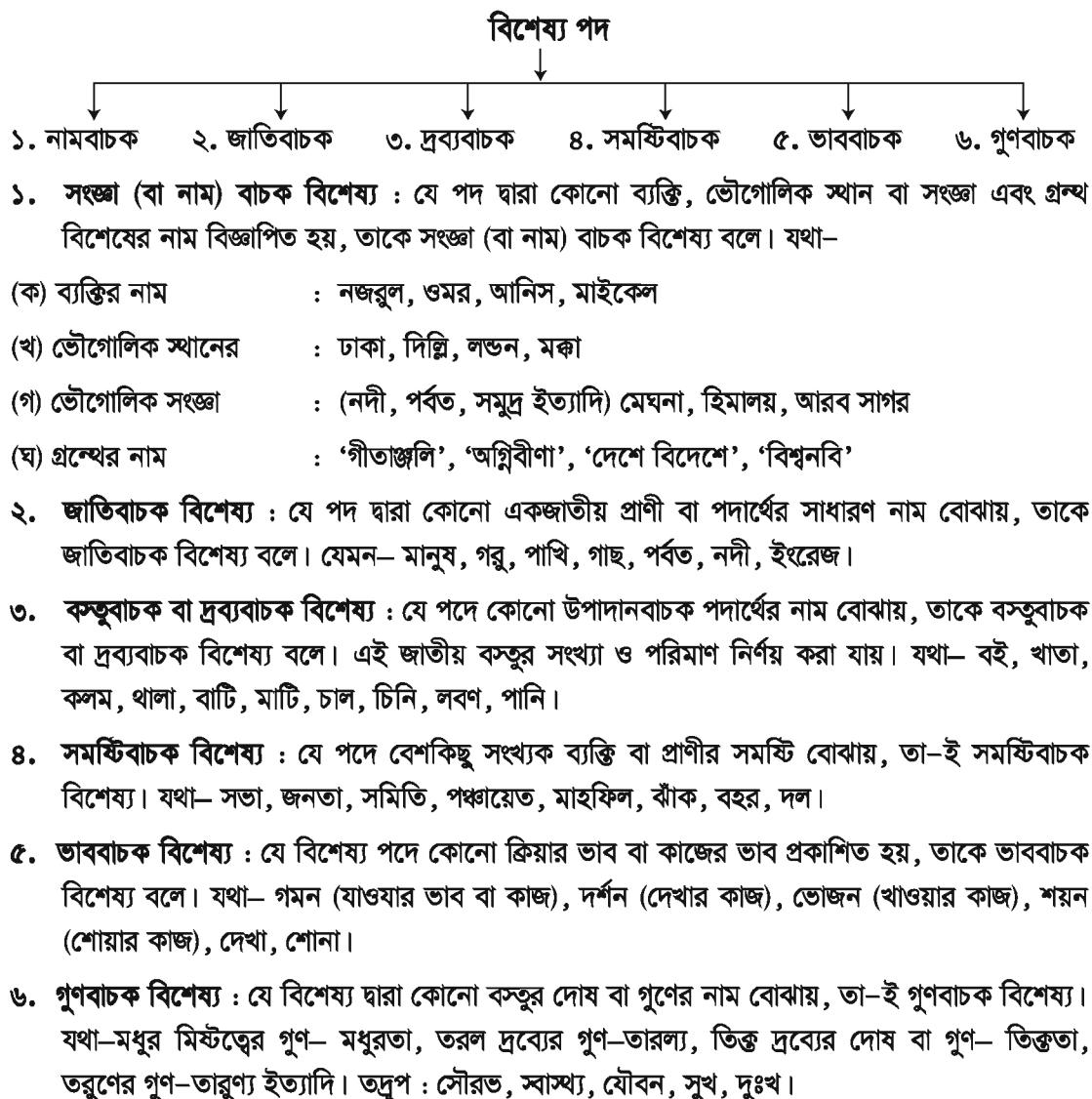
বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)



ବିଶେଷଣ ପଦ

ବିଶେଷଣ : ଯେ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ଓ କିମ୍ବା ପଦରେ ଦୋଷ, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବଲେ ।

ଚଳନ୍ତ ଗାଡ଼ି : ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ।

କର୍ମାମୟ ଭୂମି : ସର୍ବନାମେର ବିଶେଷଣ ।

ଦ୍ରୁତ ଚଲ : କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ।

ବିଶେଷଣ ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଯଥା—୧. ନାମ ବିଶେଷଣ ଓ ୨. ଭାବ ବିଶେଷଣ ।

୧. ନାମ ବିଶେଷଣ : ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଣୋ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ ପଦକେ ବିଶେଷିତ କରେ, ତାକେ ନାମ ବିଶେଷଣ ବଲେ । ଯଥା—

ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ : ସୁମ୍ଭୁ ସବଳ ଦେହକେ କେ ନା ଭାଲୋବାସେ ?

ସର୍ବନାମେର ବିଶେଷଣ : ସେ ରୂପବାନ ଓ ଗୁଣବାନ ।

ନାମ ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ

କ. ରୂପବାଚକ : ନୀଳ ଆକାଶ, ସବୁଜ ମାଠ, କାଳୋ ମେଘ ।

ଖ. ଗୁଣବାଚକ : ଚୌକ୍କ ଲୋକ, ଦକ୍ଷ କାରିଗର, ଠାଙ୍ଗ ହାଓୟା ।

ଗ. ଅବସ୍ଥାବାଚକ : ତାଜା ମାଛ, ରୋଗୀ ଛେଲେ, ଖୋଡ଼ା ପା ।

ଘ. ସଂଖ୍ୟାବାଚକ : ହାଜାର ଲୋକ, ଦଶ ଦଶା, ଶ ଟାକା ।

ଓ. କ୍ରମବାଚକ : ଦଶମ ଶ୍ରେଣି, ସତର ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରୟେମା କଲ୍ୟା ।

ଚ. ପରିମାଣବାଚକ : ବିଘାଟେକ ଜମି, ପୀଅ ଶତାହି ଭୂମି, ହାଜାର ଟନୀ ଜାହାଜ, ଏକ କେଞ୍ଜି ଚାଲ, ଦୁ କିଲୋମିଟିର ରାସ୍ତା ।

ଛ. ଅନ୍ତବାଚକ : ଅର୍ଦେକ ସମ୍ପଦି, ଯୋଳ ଆନା ଦଖଲ, ସିକି ପଥ ।

ଜ. ଉପାଦାନବାଚକ : ବେଳେ ମାଟି, ମେଟେ କଲସି, ପାଥୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ।

ଘ. ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ : କତଦୂର ପଥ ? କେମନ ଅବସ୍ଥା ?

ଓୱ. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାଜ୍ଞାପକ : ଏଇ ଲୋକ, ସେଇ ଛେଲେ, ଛାବିଶେ ମାର୍ଚ ।

ବିଭିନ୍ନଭାବେ ବିଶେଷଣ ଗଠନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି

କ. କିମ୍ବାଜାତ : ହାରାନୋ ସମ୍ପଦି, ଖାବାର ପାନି, ଅନାଗତ ଦିନ ।

ଖ. ଅବ୍ୟଯଜାତ : ଆଛା ମାନୁସ, ଉପରି ପାଓନା, ହଠାଏ ବଡ଼ଗୋକ ।

ଗ. ସର୍ବନାମ ଜାତ : କବେକାର କଥା, କୋଥାକାର କେ, ସ୍ଵାଯ ସମ୍ପଦି ।

ଘ. ସମାସସିଦ୍ଧ : ବେକାର, ନିୟମ-ବିରୁଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନହାରା, ଚୌଚାଳୀ ଘର ।

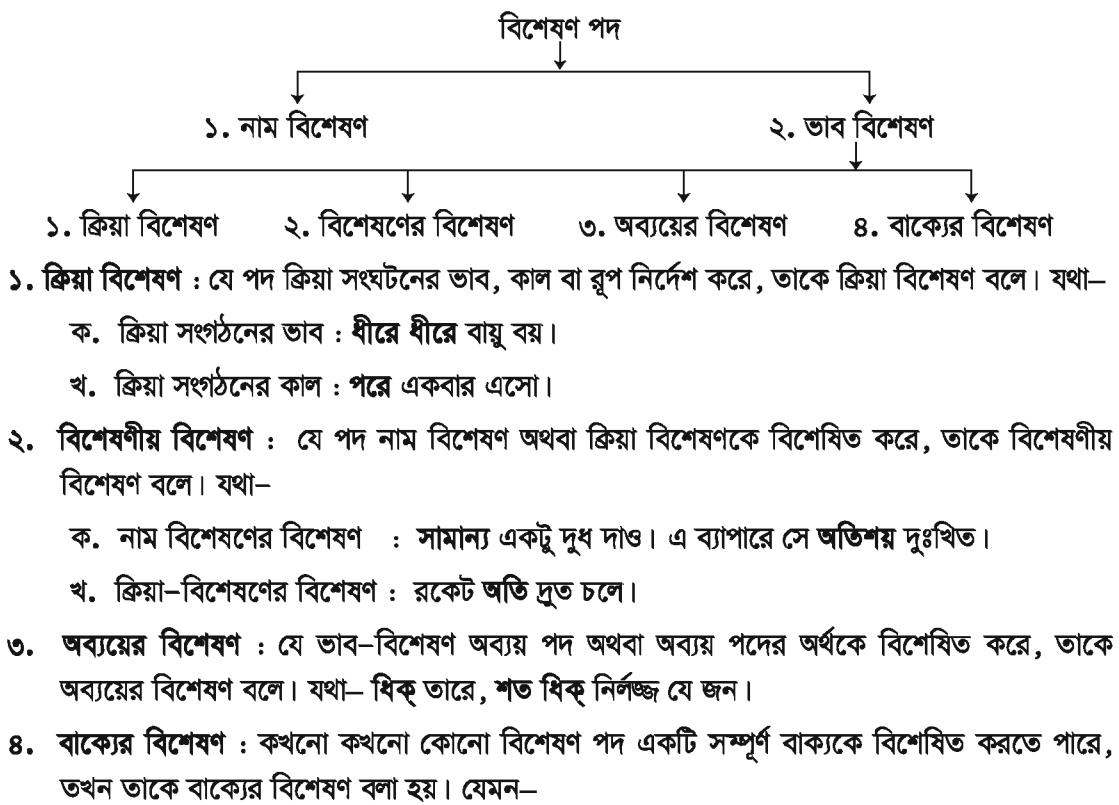
ଓ. ବୀକ୍ଷାମୂଳକ : ହାସିହାସି ମୁଖ, କାଁଦକାଁଦ ଚେହାରା, ଡୁରୁଦୁରୁ ନୌକା ।

ଚ. ଅନୁକାର ଅବ୍ୟଯଜାତ : କନକନେ ଶୀତ, ଶନଶନେ ହାଓୟା, ଧିକିଧିକି ଆଗ୍ନ, ଟ୍ସଟ୍ସେ ଫଳ, ତକତକେ ମେବେ ।

- ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
 জ. তদ্বিতাত্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
 ঝ. উপসর্গযুক্ত : নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
 ঝও. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।



১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা—

- ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
 খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা—

- ক. নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
 খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রাকেট অতি দ্রুত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা— ধীকৃ তারে, শত ধীকৃ নির্জন্জ যে জন।

৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন—

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন— যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা—

গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।

বাথের চেয়ে সিংহ বলবান।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা—

নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বৃদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা—

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ঘিরের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছেট।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন— এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ‘তর’ এবং বহুর মধ্যে ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন— গুরু—গুরুতর—গুরুতম। দীর্ঘ—দীর্ঘতর—দীর্ঘতম।

কিন্তু ‘তর’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শুভিকাটু হলে ‘তর’ প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে ‘অধিকতর’ শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন— অশু হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন— মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহান্ম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় ‘ঈয়স্’ প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় ‘ইষ্ট’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত ‘ঈয়স্’ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	লঘিষ্ট
অল্প	কলীয়ান	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যোষ্ঠ
শ্রেণ	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ঠ।

উদাহরণ : তিনি ভাইয়ের মধ্যে রহিয়ই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর শব্দিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. ‘ঈয়স্’ প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন— ভূয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

ভালো	:	বিশেষণ রূপে	-	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
		বিশেষ্য রূপে	-	আপন ভালো সবাই চায়।
মন্দ	:	বিশেষণ রূপে	-	মন্দ কথা বলতে নেই।
		বিশেষ্য রূপে	-	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
পুণ্য	:	বিশেষণ রূপে	-	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
		বিশেষ্য রূপে	-	পুণ্যে মতি হোক।
নিশ্চীথ	:	বিশেষণ রূপে	-	নিশ্চীথ রাতে বাজছে বাঁশি।
		বিশেষ্য রূপে	-	গভীর নিশ্চীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	:	বিশেষণ রূপে	-	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
		বিশেষ্য রূপে	-	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অম্বকার।
সত্য	:	বিশেষণ রূপে	-	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
		বিশেষ্য রূপে	-	এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন— হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে ‘তার’ শব্দটি প্রথম বাক্যের ‘হস্তী’ বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, ‘তার’ শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
- (২) আত্মবাচক : স্বযং, নিজে, খোদ, আগনি।
- (৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- (৪) দূরত্ববাচক : এই, এসব।
- (৫) সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাৰৎ।
- (৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?
- (৭) অনির্দিষ্টতাঞ্জপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- (৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
- (৯) সংযোগজ্ঞপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- (১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ১. ব্যক্তিবাচক | ২. আত্মবাচক |
| ৩. সামীপ্যবাচক | ৪. দূরত্ববাচক |
| ৫. সাকুল্যবাচক | ৬. প্রশ্নবাচক |
| ৭. অনির্দিষ্টতাঞ্জপক | ৮. ব্যতিহারিক |
| ৯. সংযোগজ্ঞপক | ১০. অন্যাদিবাচক |

সর্বনামের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিনি প্রকার।

১. উচ্চম পুরুষ : স্বযং বক্তাই উচ্চম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উচ্চম পুরুষ।
২. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রতৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. নাম পুরুষ : অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, কস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রতৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ শব্দই নাম পুরুষ)।



ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ

পুরুষত্ত্বে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায় : মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সন্ত্রমাত্রিক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, তাঁদেরকে, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইহাদের, এঁদের, ইহাকে, এঁকে, উনি, উঁর, উঁরা, উঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগুলী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারককে বিভক্তিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগুলী রূপ বলা হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমার একবচন		অন্যান্য কারককে বিভক্তিগুলী রূপ	
সাধারণ	সন্ত্রমাত্রিক	তুচ্ছার্থক	সন্ত্রমাত্রিক	তুচ্ছার্থিক
আমি				
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাঁহা, তা	তাহা, তা
যে	যিনি		যাহা, যা	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইহা, এঁ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উঁহা, উঁ	উহা, ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. চলিত ভাষায়—

- (ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।
- (খ) সন্ত্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্ৰকিন্দু সংযোজিত হয়। যথা— তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)। (সন্ত্রমার্থে) তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)।
২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন— তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।
৩. যষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়—প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্ৰেই ব্যবহৃত হয়। যথা :
 মৎ+ ঈয় = মদীয়, ভৎ+ ঈয় = ভবদীয়, তৎ+ ঈয় = তদীয়।
৪. ‘কী’ সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে ‘কিসে’ বা (যষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে) ‘কীসের’ রূপ গ্রহণ করে। যথা :
 কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উভয় পুরুয়ের একবচনে দীন, অধম, বাস্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—
 ‘আজ্জা কর দাসে, শাস্তি নৱাধমে’। ‘দীনের আরজ়’।
২. ছন্দবন্ধ কবিতায় সাধারণত ‘আমার’ স্থানে মম, ‘আমাদের’ স্থানে মোদের এবং ‘আমরা’ স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন — ‘কে বুঁধিবে ব্যথা মম’। ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা’।
 ‘ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি বুদ্ধনা’।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত ‘আপনি’ স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন— (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) ‘প্রভু, তুমি রক্ষা কর এ দীন সেবকে।’
৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে ‘তুমি’ সম্মোধন করা হয়।
৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
 তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচ্ছ যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

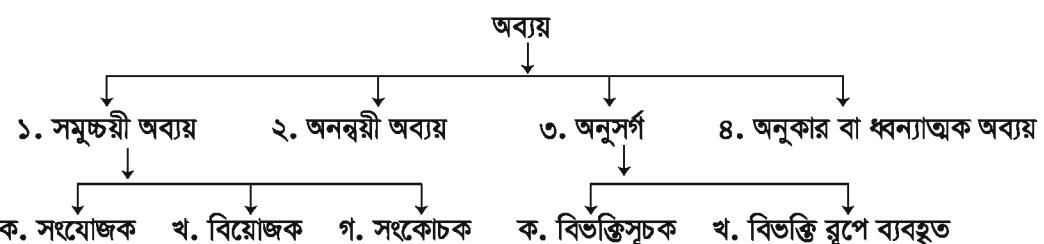
যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে— বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, ইঁয়া, না ইত্যাদি।
 ২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাত, অর্থাৎ, দৈবাত, বরৎ, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। ‘এবৎ’ ও ‘সুতরাত’ তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবৎ’ শব্দের অর্থ এমন, আর ‘সুতরাত’ অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবৎ = ও (বাংলা), সুতরাত = অতএব (বাংলা)।
 ৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।
- বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ**
১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
 ২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে : ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
 ৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
 ৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার : ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্ধযী, ৩. অনুসর্গ, ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।



১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

- (i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।
- (ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। এখানে ‘তাই’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাত শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

- (i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।

এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।

- (ii) ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।

আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক।

বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে ‘অথচ’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. অনুগামী সমৃচ্ছয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমৃচ্ছয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গা হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্ধয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধি ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্ধয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

ক. উচ্ছ্঵াস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিষ্ঠয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।

ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।

চ. যত্নণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড় লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ!
কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. সম্মোধনে : ‘ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’

ঝ. সন্ত্বাবনায় :
‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে গোকে কিছু বলে।’

এও. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নির্বর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-

১. কত না হারানো স্ফূর্তি জাগে আজও মনে।

২. ‘হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সতা, কোথায় সজ্জা।’

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা— ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্ধয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার : ক. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা—

বজ্জের ধ্বনি— কড় কড়	মেঘের গর্জন – গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ – ঝাম ঝাম	সিংহের গর্জন – গর গর
স্নোতের ধ্বনি – কল কল	ঘোড়ার ডাক – চিহি চিহি
বাতাসের গতি – শন শন	কাকের ডাক— কা কা
শুষক পাতার শব্দ – মর মর	কোকিলের রব – কুহু কুহু
নুপুরের আওয়াজ – ঝুম ঝুম	চুড়ির শব্দ – টুং টাঁৎ

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা—

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাকেয় ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা—

নাম-বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

তাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. নিত্য সম্পর্কীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্পর্কীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ—যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. ত (সম্মৃত তস) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা — ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর – পুনরাবৃত্তি অর্থে : ও দিকে আর যাব না।
- নির্দেশ অর্থে : বল, আর কী চাও?
- নিরাশায় : সে দিন কি আর আসবে?
- বাক্যালংকারে : আর কি বাজবে বাঁশি?

২. ও - সংযোগ অর্থে	:	করিম ও রাহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায়	:	আজ বৃক্ষ হতেও পারে।
তুলনায়	:	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে	:	এত চেষ্টাতেও হলো না।
৩. কি/কী-জিজ্ঞাসায়	:	‘তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরক্তি প্রকাশে	:	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে	:	কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে	:	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
৪. না-নিষেধ অর্থে	:	এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে	:	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	:	আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	:	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিষয়ে	:	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!
তুলনায়	:	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
৫. যেন - উপমায়	:	মুখ যেন পদ্ধফুল।
প্রার্থনায়	:	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	:	ইস্, ঠাণ্ডা যেন বরফ।
অনুমানে	:	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্কীকরণে	:	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	:	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তম উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) পদ কয় প্রকার?

ক. চার

গ. ছয়

খ. পাঁচ

ঘ. সাত

- (ii) বিশেষ্য পদ কয় প্রকার?
- ক. তিনি গ. শাঁচ
খ. চার ঘ. ছয়
- (iii) ভাববিশেষণ কয় প্রকার?
- ক. দুই গ. চার
খ. তিনি ঘ. শাঁচ
- (iv) সর্বনাম পদ কয় প্রকার?
- ক. দশ গ. আট
খ. নয় ঘ. সাত
- (v) অব্যয় পদ কয় প্রকার?
- ক. তিনি গ. শাঁচ
খ. চার ঘ. ছয়
- (vi) কোনটি স্থ্যোগজ্ঞাপক সর্বনাম?
- ক. যারা-তারা গ. এরা
খ. তোরা ঘ. কারা
- (vii) কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে?
- ক. ধীরে চল গ. ঘোড়া খুব দ্রুত চলে
খ. সে গুণবান ঘ. মেটে কলসি
- (viii) কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য?
- ক. ডোজন খ. চিনি
খ. সৌরভ ঘ. জনতা
- (ix) কোনটিতে বস্তুবাচক বিশেষ্য রয়েছে?
- ক. সবুজ মাঠ গ. বেলে মাটি
খ. তাজা মাছ ঘ. অর্ধেক পথ
- (x) কোন বাক্যের মোটা অক্ষরটি অনন্দয়ী অব্যয়?
- ক. তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। গ. তুমি ভালো ছাত্র তাই তোমাকে সবাই ভালোবাসে।
খ. বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম। ঘ. উঁ বজ্জ লেগেছে।

- ২। পদ বলতে কী বোঝা? পদ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে?
- ৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে যে সমস্ত বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো প্রকারভেদ অনুসারে সাজাও।
 - ক. নজরুল বাংলাদেশের চিরস্মরণীয় কবি।
 - খ. তাঁর কাব্য প্রতিভা জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছে।
 - গ. ‘ঠোকাঠুকি লেগে গেল বরগাকড়িতে।’
 - ঘ. ‘জীবন, যৌবন, বল সকলই ঘূচায় কাল, আয়ু যেন পদ্ধপত্রে নীর।’
- ৪। নাম বিশেষণকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? প্রত্যেকটি ভাগের উদাহরণ দাও।
- ৫। নির্দিষ্টাঞ্জাপক, প্রশ্নবাচক, নাম বিশেষণের উদাহরণ দাও।
- ৬। ক্রিয়া, অব্যয় ও সর্বনামজাত বিশেষণ পদের উদাহরণ দাও এবং বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
- ৭। ‘বিশেষণের অতিশায়ন’ বলতে কী বোঝা? খাঁটি বাংলা বিশেষণ শব্দের অতিশায়নের বিষয়সমূহ বিশদ আলোচনা কর।
- ৮। বাক্যগঠনে অতিশায়নের ভূল থাকলে শুন্দ কর।
মেঘনা বাংলাদেশের অধিকতম দীর্ঘতর নদী। হস্তী অশ্ব অপেক্ষা বলবন্দর। সভায় তার ভূয়াসন প্রশংসা হয়েছিল। ভাইদের মধ্যে মুমিনই সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতম।
- ৯। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বনামের সম্মতাক রূপটি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ১০। ‘তুই’ ও ‘তুমি’ সর্বনামের ব্যবহারবিধি লেখ।
- ১১। স্বরচিত বাক্যে উদাহরণ দাও।
সংকোচন অব্যয়, সম্ভাবনা ও সম্ভূতি প্রকাশে অনন্বয়ী অব্যয়, অনুভূতিগ্রাহ্য অনুকার অব্যয়।
- ১২। বিভিন্ন অর্থে ‘ও’ এবং ‘না’ অব্যয়ের ব্যবহার দেখাও।
- ১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ রূপে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
ধনী, সাধু, কাল, মধু, সুন্দর, গোলাপ, পুণ্য
- ১৪। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
তাববাচক, বিশেষ্য, বিশেষণ, রূপবাচক বিশেষণ, দূরত্বাপক সর্বনাম, অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେଦ

କ୍ରିୟାପଦ

୧. କବିର ବହି ପଡ଼ୁଛେ ।

୨. ତୋମରା ଆଗାମୀ ବହର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।

‘ପଡ଼ୁଛେ’ ଏବଂ ‘ଦେବେ’ ପଦ ଦୁଟୋ ଦାରା କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଛେ ବଲେ ଏରା କ୍ରିୟାପଦ ।

ଯେ ପଦେର ଦାରା କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଯେ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ ।

ବାକ୍ୟେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେ ପଦ ଦାରା କୋନୋ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳେ କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଘଟନ ବୋବାଯେ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ । ଓପରେର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣେ ନାମ ପୁରୁଷ ‘କବିର’ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ‘ପଡ଼ା’ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଘଟନ ପ୍ରକାଶ କରରେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ‘ତୋମରା’ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରିୟା ସଂଘଟନର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରରେ ।

କ୍ରିୟାପଦେର ଗଠନ : କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁର ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ କାଳସୂଚକ କ୍ରିୟାବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରତେ ହେଁ । ଯେମନ—

‘ପଡ଼ୁଛେ’ – ପଡ଼. ‘ଧାତୁ’ + ‘ଛେ’ ବିଭକ୍ତି ।

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ରିୟାପଦ : କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟଗଠନେର ଅପରିହାର୍ୟ ଅଞ୍ଜା । କ୍ରିୟାପଦ ଭିନ୍ନ କୋନୋ ମନୋଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଇ ନା । ତବେ କଥନୋ କଥନୋ ବାକ୍ୟେ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଥାକତେ ପାରେ । ଯେମନ—

ଇନି ଆମାର ଭାଇ = ଇନି ଆମାର ଭାଇ (ହେଲେ) ।

ଆଜ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗରମ = ଆଜ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଗରମ (ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହାତେ) ।

ତୋମାର ମା କେମନ ? = ତୋମାର ମା କେମନ (ଆହେନ) ?

ବାକ୍ୟେ ସାଧାରଣତ ହୁଏ ଏବଂ ‘ଆହ’ ଧାତୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ଥାକେ ।

କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ

ବିବିଧ ଅର୍ଥେ କ୍ରିୟାପଦକେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହେଁ ଥାକେ ।

୧. ଭାବ ପ୍ରକାଶେର ଦିକ ଦିଯେ କ୍ରିୟାପଦକେ ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଇ-କ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏବଂ ଖ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ।

କ. ସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ଦାରା ବାକ୍ୟେର (ମନୋଭାବେର) ପରିସମାପିତ ଜ୍ଞାପିତ ହେଁ, ତାକେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ – ଛେଲେରୀ ଖେଳା କରରେ । ଏ ବହର ବନ୍ୟାଯ ଫୁଲେର କ୍ଷତି ହେଁଲେ ।

ଖ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟା ଦାରା ବାକ୍ୟେର ପରିସମାପିତ ଘଟେ ନା, ବକ୍ତାର କଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥେକେ ଯାଇ, ତାକେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ-

୧. ପ୍ରଭାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ

୨. ଆମରା ହାତ-ମୁଖ ଧୁଇଁ

৩. আমরা বিকেলে খেলতে

এখানে, ‘উঠলে’ ‘ধুয়ে’ এবং ‘খেলতে’ ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

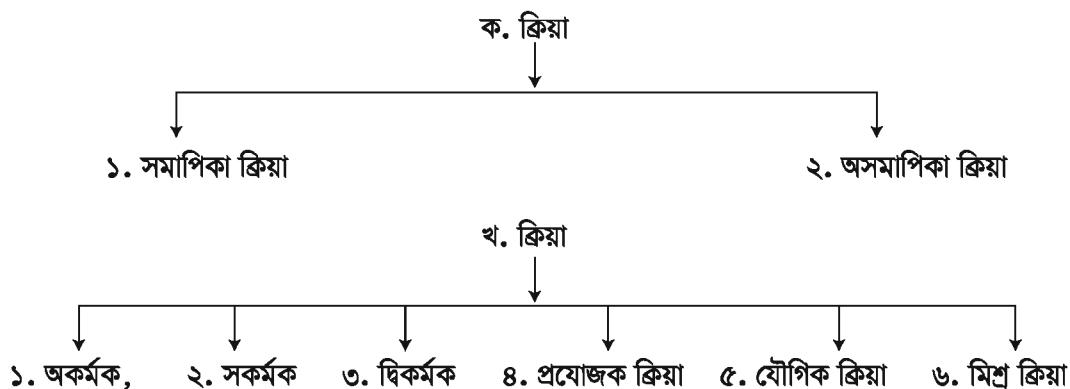
উপর্যুক্ত বাক্যগুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঁড়াবে-

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।

২. আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।

৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে), এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভিন্নিযুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।



২. সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উভের পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন-বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন ?

উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন ?

উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

‘দিয়েছেন’ ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন-মেয়েটি হাসে। ‘কী হাসে’ বা ‘কাকে হাসে’ প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই ‘হাসে’ ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাকেয়ে ‘কলম’ (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং ‘আমাকে’ (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাকেয়ের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ফর্মা-১৫, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-৯ম-১০ম প্রশ্ন।

ধাতৃর্থক কর্মপদ বলে। যেমন— আর কত খেলা খেলবে। মূল ‘খেল’ ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ ‘খেলবে’ এবং কর্মপদ ‘খেলা’ উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই ‘খেলা’ পদটি সমধাতুজ বা ধাতৃর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন—

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

বেশ এক ঘূম ঘুমিয়েছি।

আর মায়াকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন—

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে গিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন—

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন মূল ধাতু $\sqrt{\text{হাস}}$ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + চেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন—

ক. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা—

কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন – দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস – অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ-প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক - তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা- আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

৫। ঘোষিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থে প্রকাশ করে, তবে তাকে ঘোষিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে | : | ঘটনাটা শুনে রাখ। |
| খ. নিরন্তরতা অর্থে | : | তিনি বলতে লাগলেন। |
| গ. কার্যসম্পত্তি অর্থে | : | ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল। |
| ঘ. আকর্ষিকতা অর্থে | : | সাইরেন বেজে উঠল। |
| ঙ. অভ্যন্তরতা অর্থে | : | শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। |
| চ. অনুমোদন অর্থে | : | এখন যেতে পার। |

৬। মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| ক. বিশেষ্যের উভর (পরে) | : | আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। এখন গোল্লায় যাও। |
| খ. বিশেষণের উভর (পরে) | : | তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম। |
| গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উভর (পরে) | : | মাথা বিম বিম করছে। বাম বাম করে বৃক্ষ পড়ছে। |

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

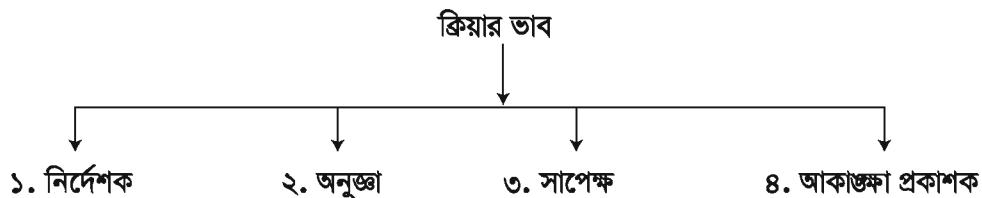
১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
২. এখন বাড়ি যাও।
৩. সে পড়লে পাশ করত।
৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপরের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)
২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)
৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)
৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)



১. নির্দেশক ভাব : সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়।

যথা—

ক. সাধারণ নির্দেশক : আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।

খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় : আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২. অনুজ্ঞা ভাব : আদেশ, নিমেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন—

ক. আদেশাত্মক : বর্তমান কালে — চুপ কর।

: ভবিষ্যৎ কালে — তুমি কাল যেও।

খ. নিমেধাত্মক : বর্তমান কালে — অন্যায় কাজ করো না।

: ভবিষ্যৎ কালে — মিথ্যা বলবে না।

গ. অনুরোধসূচক : বর্তমান কালে — ছাতাটা দিন তো ভাই।

: ভবিষ্যৎ কালে — আপনারা আসবেন।

ঘ. উপদেশাত্মক : বর্তমানে কালে — মন দিয়ে পড়।

: ভবিষ্যৎ কালে — স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩. সাপেক্ষ ভাব : একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—

ক. সম্ভাবনায় : তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।

খ. উদ্দেশ্য বোঝাতে : ভালো করে পড়লে সফল হবে।

গ. ইচ্ছা বা কামনায় : আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদে বস্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

অনুশীলনী

১। নৈর্যস্তিক প্রশ্ন

প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উভয় দেওয়া হয়েছে। ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে?

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ক. আমি ঘূম থেকে জেগেছি। | খ. আমি বেশ এক ঘূম ঘুমিয়েছি। |
| গ. আমি বেশ ঘূম দিয়েছি। | ঘ. তোমার ভালো ঘূম হয়েছিল তো? |

(ii) কোনটি মিশ্র ক্রিয়া?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. গোলায় যাও। | খ. কনকনাচ্ছ। |
| গ. বেজে ওঠা। | ঘ. দেখাচ্ছেন। |

(iii) কোন বাক্যটি অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ করছে?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ক. আমি বাড়ি যাই। | খ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর। |
| গ. পরিশ্রম করলে সফল হবে। | ঘ. তার মঙ্গল হোক। |

(iv) কোন বাক্যটিতে নামধাতুর ক্রিয়াপদ রয়েছে?

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। | খ. আমরা কৃতুবমিনার দর্শন করলাম। |
| গ. শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন। | ঘ. তুমি যেতে পার। |

(v) কোন বাক্যটি সাপেক্ষ ভাব প্রকাশ করছে?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ক. আমাকে বই দাও। | খ. যদি সে যেত, আমি আসতাম। |
| গ. তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। | ঘ. রেবা ভালো গান করে। |

(vi) কোন বাক্যটিতে যৌগিক ক্রিয়াপদ রয়েছে?

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ক. তুমি এখন গান করতে পার। | খ. আমি এইমাত্র এলাম। |
| গ. শিক্ষক মহোদয় বাঞ্ছা পড়াচ্ছেন। | ঘ. হামিদকে দেখে খুশি হলাম। |

(vii) কোন বাক্যটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ক. চল খেলতে যাই। | খ. আর মায়াকান্না কেঁদো না। |
| গ. আমাকে বইটা দাও। | ঘ. সাপুড়ে সাপ খেলায়। |

(viii) কোন বাক্যটির ক্রিয়া সকর্মক?

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ক. চুপ করে থাক। | খ. আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে নেমেছে। |
| গ. আকাশে চাঁদ উঠেছে। | ঘ. শিশুটি কাঁদে। |

(ix) কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ক. মাথা বিম বিম করছে। | খ. তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে। |
| গ. মা শিশুটিকে হাসান। | ঘ. শিশুটি কাঁদে। |

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া আছে?

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ক. এ নদীতে প্রচুর মাছ আছে। | খ. আমরা হাত-মুখ ধুয়ে বেড়াতে বের হব। |
| গ. ঝুপকথার গল্প শোন। | ঘ. তুমি কোথায় যাচ্ছ? |

২। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

৩। বাংলা বাক্য গঠনে কোন কোন ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে? উদাহরণ দাও।

৪। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ সহযোগে বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে বলা হয় এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে বলা হয়।

খ. বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একটি থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয়।

৬। প্রযোজক ক্রিয়া এবং নামধাতু ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।

৭। যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে? যৌগিক ও মিশ্র ক্রিয়ার পার্থক্য লেখ।

৮। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় কী? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৯। ‘ক্রিয়ার ভাব’ বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়াপদের তিনটি উদাহরণ দাও।

১০। ‘আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব’ বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের প্রয়োগ দেখাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

১. আমরা বই পড়ি। ‘পড়া’ ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

২. কাল তুমি শহরে গিয়েছিলে। ‘যাওয়া’ ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আগামীকাল স্কুল বস্থ থাকবে। ‘বস্থ থাকা’ কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

এ হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিনি প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভৌতে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-

আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।)

খ. বচনভৌতে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যথা-

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়।
তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সন্ত্রমাত্রক, তুচ্ছার্থকভৌতে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে
(উভয় পুরুষে হয় না)। যেমন –

সাধারণ	সন্ত্রমাত্রক	তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক
উভয় পুরুষ	আমি যাই	--
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও	আপনি যান
	তোমরা যাও	আপনারা যান
নাম পুরুষ	সে যায়	তিনি যান
	তারা যায়	তাঁরা যান

কালের প্রকারভৌত

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. বর্তমান কাল : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান

খ. ঘটমান বর্তমান

গ. পুনাদ্বিতী বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত
 খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
 গ. ঘটমান অতীত
 ঘ. পুরাঘটিত অতীত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ^১
 খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ^২
 গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ^৩

বর্তমান কাল

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন— সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোধালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা—

- সন্ধিয়ায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)
 আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

- (১) স্থায়ী সত্য প্রকাশে : চার আর তিনে সাত হয়।
- (২) ঐতিহাসিক বর্তমান : অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে।
 যেমন—
 বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- (৩) কাব্যের ভগিতায় : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
 কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।
- (৪) অনিচ্ছয়তা প্রকাশে : কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।
- (৫) ‘যদি’, ‘যখন’, ‘যেন’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন—
 বৃক্ষ যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব।
 সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে।
 বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।
- (২) প্রাচীন লেখকের উন্মৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চঙ্গীদাস বলেন, ‘সবার উপরে মানুষ
সত্য, তাহার উপরে নাই।’
- (৩) বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।
- (৪) ‘নেই’, ‘নাই’ বা ‘নি’ শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে ঘাননি।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল
ব্যবহৃত হয়। যথা—হাসান বই পড়ছে। নীরা গান গাইছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা—বক্তা বললেন, “শত্রুর অত্যাচারে
দেশ আজ বিপন্ন, ধন—সম্পদ জুঁগিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন ঝুলছে।”
- (২) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই আসছি।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান
কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন—

এবার আমি পরীক্ষায় উভীর হয়েছি।

এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংষ্টিন কালই সাধারণ অতীত
কাল। যেমন—

প্রদীপ নিতে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : ‘এক্ষণে জানিশাম, কুসুমে কীট আছে।’
- (২) বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় হওয়াম।

২. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
বলে। যেমন—

আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ করতাম।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।

(২) অসম্ভব কল্পনায় : ‘সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ’।

(৩) সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে তালোই হতো।

৩. ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি—কিয়া সংঘটনের এরূপ তাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন-

কাল সম্ম্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা তখন বই পড়ছিলাম। বাবা আমাদের পড়াশুনা দেখছিলেন।

৪. পুরাধ্বিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাধ্বিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন-

সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি কি তুমি করেছিলে?

(ক) অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা গিয়েছিল।

আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ দিয়েছিলাম।

(খ) অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাধ্বিত অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন—
বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা—

আমরা মাঠে খেলতে যাব।

শীঘ্ৰই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন—কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে? সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি থাকবে?

(২) অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন— ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো ‘বিশ্বনবি’ পড়ে থাকবে।

১. ঘটমান ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার বূপ

নাম পুরুষ সাধারণ :—ইতে থাকিবে/—তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ :—ইতে থাকিবেন/—তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

(সন্ত্রমাত্রক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ :—ইতে থাকিবে/—তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক :—ইতে থাকিবে/—তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উভয় পুরুষ :—ইতে থাকিব/—তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলে।

লক্ষ করার বিষয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার -ইতে / -তে বিভিন্ন যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভিন্ন যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে -ইতে/তে-বিভিন্ন যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভিন্নই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

২. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভিন্ন-ইয়া/এ যোগ করে এবং থাক ও গম ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভিন্ন যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা - গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- (i) কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
 - ক. আমরা গিয়েছি
 - খ. তুমি যেতে থাক
 - গ. সে কি গিয়েছিল?
 - ঘ. সেখানে গিয়ে দেখে এসো
- (ii) কোন বাক্যটি ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
 - ক. এ কথা জানতে তুমি
 - খ. ‘দেখে এলাম তারে’
 - গ. কে যেন আসছে
 - ঘ. ‘আবার আসিব ফিরে’
- (iii) কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
 - ক. আমি রোজ স্কুলে যাই
 - খ. বাবরের পর হুমায়ুন বাদশা হন
 - গ. কেন যে তুমি আস না
 - ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?
- (iv) সে হয়তো ‘এসে থাকবে’-এখানে কোন কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
 - ক. পুরাঘটিত বর্তমান
 - খ. ঘটমান অতীত
 - গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
 - ঘ. সাধারণ অতীত
- (v) কাজ শেষ করার জন্য সে আদাজল ‘খেয়ে লেগেছে’-এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে-
 - ক. সাধারণ বর্তমান
 - খ. ঘটমান বর্তমান
 - গ. পুরাঘটিত বর্তমান
 - ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

- (vi) ‘সাতাশ ‘হত’ যদি একশ সাতাশ’—এখানে ‘হত’ কোন কালের ক্রিয়া?
 ক. পুরাঘটিত অতীত
 খ. পুরাঘটিত বর্তমান
 গ. সাধারণ অতীত
 ঘ. নিত্যবৃন্ত অতীত
- (vii) ত্রিশ দক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাক্যটি কোন কালের?
 ক. সাধারণ বর্তমান
 খ. নিত্যবৃন্ত বর্তমান
 গ. পুরাঘটিত অতীত
 ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান
- (viii) তিনি গতকাল ঢাকা ‘যান’ নি—ক্রিয়াটি কোন কালের?
 ক. পুরাঘটিত বর্তমান
 খ. সাধারণ বর্তমান
 গ. পুরাঘটিত অতীত
 ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান
- (ix) কোনটি নিত্যবৃন্ত অতীতের উদাহরণ?
 ক. আমি রোজ সকালে বেড়াই
 খ. আমি রোজ বেড়াতে যাব
 গ. তোমাকে রোজ যেতে হবে
 ঘ. আমি রোজ স্কুলে যেতাম
- (x) কোনটি পুরাঘটিত বর্তমানের উদাহরণ?
 ক. আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি
 খ. আমি কথা কইব না
 গ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম
 ঘ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি
- ২। ‘কাল’ বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের নাম লেখ।
- ৩। ‘পুরুষ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।’—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- ৪। ‘পুরুষভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।’—উদাহরণ সহযোগে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
- ৫। স্বরচিত বাক্যে নিত্যবৃন্ত বর্তমান কালের চারটি বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।
- ৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে কী কী অর্থে বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ হয়েছে তা নির্দেশ কর।
 ক. ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যাই ভূরি ভূরি।’
 খ. ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।’
 গ. ‘চিন্তার কারণ নেই, কালই তাকে মজা দেখাচ্ছি।’
 ঘ. সে গত মাসেও কাজে যোগদান করেনি।
 ঙ. ‘এতক্ষণে বুঝিলাম, প্রীতির উৎস পার্থিব সম্পদ।’
- ৭। নিত্যবৃন্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে চারটি বাক্য রচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও উদাহরণ ‘ক্রিয়াপদ’ সম্পর্কে আলোচনা (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হবে।

সমাপিকা ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা-

আনোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া – সকর্মক, কাল – বর্তমান)।

মাসুদ সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া – অকর্মক, কাল – অতীত)।

আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া – দ্বিকর্মক, কাল-ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ-ইয়া (য়ে), -ইতে (তে) অথবা -ইলে (লে) বিভিন্ন যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন – যত্ত্ব করলে রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়-

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা – তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? ‘পেলে’ (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং ‘আসবে’ (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে ‘তুমি’।
২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। যেমন-
- ক. শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। উদাহরণ – তোমরা বাড়ি এগে আমি রওনা হব। এখানে ‘এগে’ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘তোমরা’ এবং ‘রওনা হব’ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘আমি’। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন – সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে ‘যাত্রীদের’ পথ চলার সঙ্গে ‘সূর্য’ অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে ‘সূর্য’ নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. ‘ইলে’ > ‘লে’ বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|----------------------------|---|
| ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে | : চারটা বাজলে স্কুলের ছুটি হবে। |
| খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় ডাপনে | : একবার মরলে কি কেউ ফেরে? |
| গ. সম্ভাব্যতা অর্থে | : এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে। |
| ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে | : তিনি গেলে কাজ হবে। |
| ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে | : ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?’ |
| চ. বিধিনির্দেশে | : এখানে প্রচারপত্র লাগলে ফৌজদারিতে সোপান হবে। |
| ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে | : আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা। |
| জ. পরিণতি বোঝাতে | : বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে। |

২. ‘ইয়া’ > ‘এ’ বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|---------------------------------|--|
| ক. অনঙ্গরতা বা পর্যায় বোঝাতে | : হাত-মুখ ধূয়ে পড়তে বস। |
| খ. হেতু অর্থে | : ছেলেটি কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল। |
| গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে | : চেঁচিয়ে কথা বলো না। |
| ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে | : ‘হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গান।’ |
| ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে | : সেখানে আর গিয়ে কাজ নেই। |
| চ. অব্যয় পদের অনুরূপ | : ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব। |

৩. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ক. ইচ্ছা প্রকাশে | : এখন আমি যেতে চাই। |
| খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে | : মেলা দেখতে ঢাকা যাব। |
| গ. সামর্থ্য বোঝাতে | : খোকা এখন হাঁটতে পারে। |
| ঘ. বিধি বোঝাতে | : বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়। |
| ঙ. দেখা বা জানা অর্থে | : রমলা গাইতে জানে। |
| চ. আবশ্যিকতা বোঝাতে | : এখন ট্রেন ধরতে হবে। |

- ছ. সূচনা বোঝাতে : রানি এখন ইংরেজি পড়তে শিখেছে।
 জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে দৌড়াতে দেখলাম।
 ঘ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে থাকতে দেখিনি।
 ঙ. অনুসর্গরূপে : ‘কোন দেশেতে তরুণতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।’
 ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অন্য সাধনে : ‘দেখিতে বাসনা মাগো তোমার চরণ।’
 ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্য সাধনে : পদ্মফুল দেখতে সুন্দর।

৪. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার বিত্ত প্রয়োগ

- ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : ‘কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।’
 খ. সমকাল বোঝাতে : ‘সেউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
 সেউতি হইল সোনা ‘দেখিতে দেখিতে’।

টীকা : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন— গরু মেরে জুতা দান। আঙুল ফুলে কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়., দেখ., লাগ., ফেল., আস., উঠ., দে., লহ., থাক., প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

১. যা-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি থেমে গেল।
 খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক গেয়ে যাচ্ছেন।
 গ. ক্রমশ অর্থে : চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।
 ঘ. সন্তানবা অর্থে : এখন যাওয়া যেতে পারে।

২. পড়-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন শুয়ে পড়।
 খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে।
 গ. আকস্মিকতা অর্থে : এখনই তুফান এসে পড়বে।
 ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছি।

৩. দেখ-ধাতু

- ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে চেয়ে দেখ।
 খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণটা চেথে দেখ।
 গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে বলে দেখ।

৪. আস-ধাতু

- ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকেলে বৃষ্টি আসতে পারে।
 খ. অভ্যন্তরায় : আমরা এ কাজই করে আসছি।
 গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

৫. দি-ধাতু

- ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে যেতে দাও।
 খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ করে দিলাম।
 গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও।

৬. নি-ধাতু

- ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এবার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও।
 খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা করে নাও।

৭. ফেল-ধাতু

- ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সল্দেশগুলো খেয়ে ফেল।
 খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা হেসে ফেলল।

৮. উঠ-ধাতু

- ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : খণের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে।
 খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি রেগে উঠেন।
 গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাতে চেঁচিয়ে উঠল।
 ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা হয়ে উঠল না।
 ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য হয়ে উঠে না।

৯. শাগ-ধাতু

- ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে শাগল।
 খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে শাগ তো দেখি।

১০. থাক্ক-থাতু

- ক. নিরন্তরতা অর্থে : এবার ভাবতে থাক।
 খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়তো বলে থাকবেন।
 গ. সদেহ প্রকাশে : সে-ই কাজটা করে থাকবে।
 ঘ. নির্দেশে : আর দরকার নেই, এবার বলে থাক।

অনুশীলনী

১। সঠিক উভরচিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- (i) কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভাবনা প্রকাশ করছে?
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ক. বৃষ্টি থেমে গেল | গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে |
| খ. এক্সুণি বৃষ্টি এসে পড়বে | ঘ. সে গান করতে পারে। |
- (ii) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ক. জন্মভূমি সর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ | গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই |
| খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে | ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে? |
- (iii) কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল | গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল |
| খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল | ঘ. সে এলে আমি যাব। |
- (iv) কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ক. আকাশে চাঁদ উঠলে আজড়া ভাঙ্গে | গ. বৃষ্টিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে |
| খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না | ঘ. ভূমি যদি যাও, সে যাবে। |
- (v) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশংসন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়েছে?
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ক. তুমি কি এখন যাবে? | গ. ‘জনিলে মরিতে হবে।’ |
| খ. মরলে কি কেউ ফেরে? | ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা। |
- (vi) কোন বাক্যে আবশ্যকতা বোঝাতে ইতে > তে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ক. তোমাকে দেখতে চাই | গ. খোকা এখন পড়তে পারে |
| খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি | ঘ. এখন ট্রেন ধরতে হবে। |

(vii) কোন বাক্যে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. কষ্টি পাথরে সোনা কমে নাও

গ. এখন ভাবতে থাক

খ. আমাকে করতে দাও

ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি।

(viii) কোন বাক্যে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন

গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক

খ. কাজ করে সে বসে থাকবে

ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে?

(ix) কোন বাক্যে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?

ক. কথা কয়ে দেখ

গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব

খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলেছে

ঘ. এখন গিয়ে কী করবে?

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া নিমিত্ত অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দেখতে দেখতে সে এসে গেল

গ. পরীক্ষা দিতে ঢাকা যাব

খ. মেরোটি গাইতে জানে

ঘ. সে খেতে ভালোবাসে।

২। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়ে বুবিয়ে দাও।

৩। এক কর্তা, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ দাও। নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?

৪। অসমাপিকা ক্রিয়াতে কী কী বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকে? স্বরচিত বাক্যে এদের প্রয়োগ দেখাও।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে কী কী অর্থে ‘ইলে’ বা ‘লে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে বুবিয়ে লেখ।

ক. ছুটি হলে দেশে যাব।

খ. বৃক্ষি হলে ভালো ফসল হয়।

গ. ‘জন্মলে মরিতে হবে।’

ঘ. তার কথা শুনলে হাসি পায়।

ঙ. চাচা গেলেও যে কাজ হবে, আমি গেলেও সেই কাজ হবে।

৬। উদাহরণ দাও।

ক. ক্রিয়া সংঘটনের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ-----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।

খ. হেতু অর্থে----‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি।

গ. অনুসর্গ রূপে----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।

- ৭। নিম্নলিখিত অর্থে ‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও-
- বিধি বোঝাতে।
 - ক্রিয়ার নিরন্তরতা প্রকাশে।
 - শেখা অর্থে।
 - ক্রিয়ার বিশেষ্য গঠনে।
 - সমকালতা বোঝাতে।
 - উপকৰণ অর্থে।
 - আবশ্যকতা অর্থে।
- ৮। যৌগিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ ? যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি সংক্ষেপে লেখ।
- ৯। নিম্নলিখিত বাক্যের মধ্যে মোটা হরফে লিখিত পদসমূহে কোন কোন অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে ?
- সাইরেন বেজে উঠল।
 - সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।
 - নির্যাতিতরাই একদিন মাথা উঠিয়ে উঠবে।
 - নেয়ে খেয়ে এস।
 - হঠাত ঘূম ভেঙে যায়।
 - এ কাকে ডেকে এনেছিস ?
 - তারপরই নিরুদ্দেশ হয়ে যাই দীর্ঘ দিনের জন্য।
- ১০। অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে শূন্যস্থান পূরণ কর-
- কাদিতে----জীবন গেল।
 - বড় যদি----চাও, ছেট হও তবে।
 - খোকাকে----দেখলে----দিও।
 - নাসিমা কি গান----জানত ?
 - আজ বৃক্ষ----পারে।
 - ডেকে দিও।
 - ‘-----করিও কাজ----ভাবিও না।’
 - সুখের-----এ ঘর বাঁধিনু অনলে----গেল।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলা অনুজ্ঞা

ক. কাল একবার এসো।

খ. তুই বাড়ি যা।

গ. ‘ক্ষমা কর মোর অপরাধ।’

ওপরের বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে।

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যেন্ত্রে হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়। তোরা (বই) পড়।

কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ অর্থে সন্ত্বার্থাক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘আপনি’ বা ‘আপনারা’ এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘তুমি’ বা ‘তোমরা’ পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন—

সন্ত্বার্থাক মধ্যম পুরুষ— আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ— তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে ‘হ’ যোগ করার নিয়ম ছিল। এই ‘হ’ বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—

ক. ‘করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।’

খ. ‘অধম সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।’

৩. ক. উভয় পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপঃ

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ/ক্রিয়াপদ
১. সন্ত্বার্থাক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
২. সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
৩. তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর, যা
৪. সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য : ক. নির্দেশক তাবের সাধারণ বর্তমান কালের সন্ত্বার্থাক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন— আপনি দেখেন।

সন্ত্রমাত্রাক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি— ‘উন’। যেমন—আপনারা দেখুন।

খ. চলতি ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ—কারান্ত বা ও—কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন—নেন, লেন, নিন < লউন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সন্ত্রমাত্রাক	আপনি, আপনারা,	-ইবেন	-বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	-ইও	-ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	-ইস	-স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	-ইবে	-বে	করিবে	করবে

দ্রষ্টব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে -ইতে/-তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং থাক ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি যুক্ত করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয়ে মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

(সে)-ইতে/-তে + -টক (করিতে/করতে থাকুক)।

(তিনি/আপনি) -ইতে/-তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)

(তুমি)-ইতে/-তে + -অ-ও (করিতে/করতে থাক/থাকো)।

(তুই)-ইতে/তে + - ০ (করিতে/করতে থাক)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইতে/-তে যুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত থাক ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

থাক ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার জন্য পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। যেমন—

-ইতে/-তে+ - ইবেন/- বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

-ইতে/ -তে + ইও - এ/-ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

-ইতে/ - তে + -ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

-ইতে/ -তে+ - ইবে/-বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

- ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উভয় পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।
 খ) সন্ত্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সন্ত্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

(১) আদেশ	:	কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
(২) উপদেশ	:	সত্য গোপন করো না। কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না। 'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।'
(৩) অনুরোধ	:	আমার কাজটা এখন কর। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
(৪) প্রার্থনা	:	আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
(৫) অভিশাপ	:	মর, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

(১) আদেশ	:	সদা সত্য বলবে।
(২) সম্ভাবনায়	:	চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
(৩) বিধান অর্থে	:	রোগ হলে ওষুধ খাবে।
(৪) অনুরোধে	:	কাল একবার এসো (বা আসিও বা আসিবে)।

অনুশীলনী

- ১। প্রতি প্রশ্নের চারটি উত্তরের ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।
- (i) কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে?
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ক. রোগ হলে ওষুধ খেতে হবে | গ. চেষ্টা কর, বুঝতে পারবে |
| খ. সদা সত্য বলবে | ঘ. কাল এসো। |
- (ii) তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
- | | |
|--------|--------|
| ক. -ইস | গ. -ও |
| খ. -স | ঘ. -ইও |
- (iii) সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
- | | |
|--------|----------|
| ক. -উন | গ. -ও |
| খ. -ন | ঘ. শুন্য |

(iv) ‘ওখানে যাস না।’ – কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ

গ. অনুরোধ

খ. উপদেশ

ঘ. বিধান

(v) ‘খোদা আপনার মঙ্গল করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ

গ. উপদেশ

খ. প্রার্থনা

ঘ. অনুরোধ।

(vi) ‘ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ

গ. অনুরোধ

খ. উপদেশ

ঘ. বিধান।

(vii) ‘তোর সর্বনাশ হোক।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. প্রার্থনা

গ. অভিশাপ

খ. উপদেশ

ঘ. আদেশ।

(viii) ‘আমাকে সাহায্য করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. অনুরোধ

গ. আদেশ

খ. প্রার্থনা

ঘ. উপদেশ।

২। অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ? কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়?

৩। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার বিভিন্নসমূহ লেখ।

৪। ‘ভবিষ্যৎ অর্থে অনুজ্ঞা পদ মধ্যম পুরুষেই সীমাবদ্ধ।’ – এ উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।

৫। বাক্য গঠন কর

ক. অনুরোধ বর্তমান অনুজ্ঞা

খ. সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

গ. অভিশাপে বর্তমান অনুজ্ঞা

ঘ. উপদেশে বর্তমান অনুজ্ঞা।

৬। কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর পাশে লেখ।

ক) ‘গুগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’

খ) ‘তবে যদি দয়া কর, ক্ষমা করো মোর অপরাধ।’

গ) ‘রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।’

ঘ) খোদা তোমার হায়াত দরাজ করুন।

ঙ) সে জাহানামে যাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্রিয়া-বিভক্তি : সাধু ও চলিত

আমি যাই।

আপনারা যাবেন।

সে যাচ্ছে।

তাঁরা যাচ্ছিলেন।

ওপরে যা-ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, ‘বেন’, ‘চে’ ও ‘ছিলেন’ বিভক্তি যুক্ত করে সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলো গঠিত হয়েছে।

ধাতুর উভয় যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে, এই সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলা হয়।

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন-

আমি যাই-সাধারণ বর্তমান কালে উভয় পুরুষের ক্রিয়াপদ।

আপনারা যাবেন—সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে (সন্ত্রামাত্বক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তন হয়। যথা-

সাধু

আপনি ভাত খাইয়াছেন।

তাহারা বাড়ি যাইতেছে।

চলিত

আপনি ভাত খেয়েছেন।

তারা বাড়ি যাচ্ছে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়াতেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-

সাধু রীতি (প্রযোজক)

আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।

রত্ন মণিকে গান শিখাইতেছিল।

চলিত রীতি (প্রযোজক)

আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।

রত্ন মণিকে গান শেখাচ্ছিল।

ধাতুর গণ : ‘গণ’ শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর ‘গণ’ বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। ‘ধাতুর গণ’ ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন-

(ক) ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত?

(খ) ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

‘হওয়া’ ক্রিয়ার ধাতু ০ হ (হ + অ)। ‘হ’ একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ হ-এর সাথে স্বরবর্ণ ‘অ’ যুক্ত আছে। সুতরাং হ-আদিগণের মধ্যে ল-ধাতু (ক্রিয়াপদ-লওয়া) পড়বে।

বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

- | | | |
|-------------------|---|---|
| ১। হ-আদিগণ | : | হ (হওয়া), ল (লওয়া) ইত্যাদি। |
| ২। খ-আদিগণ | : | খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া) ইত্যাদি। |
| ৩। দি-আদিগণ | : | দি (দেওয়া), নি (নেওয়া) ইত্যাদি। |
| ৪। শু-আদিগণ | : | ছু (চোঁয়ানো), নু (নোয়ানো), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি। |
| ৫। কর-আদিগণ | : | কর (করা), কম (কমা), গড় (গড়া), চল (চলা) ইত্যাদি। |
| ৬। কহ-আদিগণ | : | কহ (কহা), সহ (সহা), বহ (বহা) ইত্যাদি। |
| ৭। কাট-আদিগণ | : | গাথ, চাল, আক, বাধ, কাদ, ইত্যাদি। |
| ৮। গাহ-আদিগণ | : | চাহ, বাহ, নাহ (নাহানস্নান) ইত্যাদি। |
| ৯। লিখ-আদিগণ | : | কিন্দ, ঘির, জিজ্ঞ, ফির, ডিঝ, চিন্দ ইত্যাদি। |
| ১০। উঠ-আদিগণ | : | উড়, শুন, ফুট, খুঁজ, খুল, দুব, তুল ইত্যাদি। |
| ১১। লাফা-আদিগণ | : | কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি। |
| ১২। নাহা-আদিগণ | : | গাহা ইত্যাদি। |
| ১৩। ফিরা-আদিগণ | : | ছিটা, শিখা, বিমা, চিরা ইত্যাদি। |
| ১৪। ঘূরা-আদিগণ | : | উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচে) ইত্যাদি। |
| ১৫। ধোয়া-আদিগণ | : | শোয়া, থোঁচা, ধোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি। |
| ১৬। দৌড়া-আদিগণ | : | পৌছা, দৌড়া ইত্যাদি। |
| ১৭। চটকা-আদিগণ | : | সম্বা, ধম্বকা, কচ্ছা ইত্যাদি। |
| ১৮। বিগড়া-আদিগণ | : | হিচড়া, ছিটকা, সিটকা ইত্যাদি। |
| ১৯। উল্টা-আদিগণ | : | দুমড়া, মুচড়া, উপ্চা ইত্যাদি। |
| ২০। ছোবলা - আদিগণ | : | কেঁচকা, কেঁকড়া, কোদলা ইত্যাদি। |

ধাতু-বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সন্ত্রমাত্রিক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উভয় পুরুষ	
	সে		তুমি		তুই		আমি			
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ	-এ	-এ	-এন	-এন	-অ	-অ	-ইস্	-ইস্	-ই	-ই
২. ঘটমান	-ইতেছে	-ছে	-ইতেছেন	-ছেন	-ইতেছ	-ছ	-ইতেছিস্	-ছিস্	-ইতেছি	-ছি
৩. পুরাধাচিত	-ইয়াছে	-এছে	-ইয়াছেন	-এছেন	-ইয়াছ	-এছ	-ইয়াছিস্	-এছিস্	-ইয়াছি	-এছি
৪. অনুজ্ঞা	-উক	-উক	-উন	-উন	-অ	-ও	-অ	-মূলধাতু	-মূলধাতু	

মন্তব্য : -ইতেছ, -ছ, -ইয়াছ, -এছ, বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ-কারাত্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম পুরুষ (সন্ত্রমাত্রিক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে		তিনি	আপনি	তৃষ্ণি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
৫। সাধারণ	-ইল	-ল	-ইলেন	-লেন	-ইলে	-লে	-ইলি	-লি	-ইলাম	-লাম -লুম
৬। নিত্যবৃত্ত	-ইত	-তে	-ইতেন	-তেন	-ইতে	-তে	-ইতিস্	-তিস্	-ইতাম	-তাম -তুম
৭। ঘটমান	-ইতেছিল	-ছিল	-ইতেছিলেন-ছিলেন	-ইতেছিলে-ছিলে	-ইতেছিলে-ছিলে	-ইতেছিলি-ছিলি	-ইতেছিলাম-ছিলাম	-ছিলি		
৮। পুরাধিত	ইয়াছিল	-এছিল	-ইয়াছিলেন-এছিলেন	-ইয়াছিলে-এছিলে	-ইয়াছিলে-এছিলে	-ইয়াছিলি-এছিলি	-ইয়াছিলাম-এছিলাম	-ইয়াছিলি	-ইয়াছিলাম-এছিলাম	-ইয়াছি-এছিলাম

দ্রষ্টব্য : পরে, ‘ছ’ থাকলে কর ধাতুর ‘র’ লোপ পায়। (কচিলে, কচিলি)।

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইবে	-বে	-ইবি	-বি	-ইব	-ব	-বো
১০। অনুজ্ঞা	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইও	-ও	-ইস	-ইস			

দ্রষ্টব্য : -ইল, -ল, -ইত, -ইতেছিল, -ছিল, -এছিল বিভক্তিগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

কর ধাতুর রূপ (সর, গড়, চল্প প্রভৃতি কর-আদিগণ)

কাল	সে	তিনি		আপনি		তৃষ্ণি	তুই	আমি		
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত			সাধু	চলিত	
১। সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
২। ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিছে	করছ	করিতেছিস	করছিস	করিতেছি	করছি
৩। পুরাধিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াছিস	করেছিস	করিয়াছি	করেছি
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা/ আক্ষেপ	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	করু	করু	০	০
৫। সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
৬। নিত্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
৭। ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করেছিল	করিতেছিলেন	করাছিলেন	করিতেছিল	করাছিলে	করিতেছিলি	করাছিলি	করিতেছিলাম	করাছিলাম
৮। পুরাধিত অতীত	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিলে	করেছিলে	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করিব	করব
১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করব।

কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ – শব্দগুলো শেষ ধ্বনির উচ্চারণ অ-কারান্ত।

যা-ধাতুর রূপ

(আদ্বৰ্ণ আ-কার যুক্ত-থা, যা, পা, ধা প্রভৃতি থা-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। যায় যান যাও যাইস যাই।	১। যায় যান যাও যাস যাই।
২। যাইতেছে যাইতেছেন যাইতেছ যাইতেছিস যাইতেছি।	২। যাচ্ছে যাচ্ছেন যাচ্ছ যাচ্ছিস যাচ্ছি।
৩। গিয়াছে গিয়াছেন গিয়াছ গিয়াছিস গিয়াছি।	৩। গেছে (গিয়েছে) গিয়েছেন (গেছেন) গিয়েছ (গেছ) গিয়েছিস (গেছিস) গিয়েছি (গেছি)।
৪। যাউক (যাক) যান যাও যা।	৪। যাক যান যাও যা।
৫। গেল (যাইল) গেলেন (যাইলেন) গেলে (যাইলে) গেলি (যাইলি) গেলাম (যাইলাম)	৫। গেল গেলেন গেলে গেলি গেলাম।
৬। যাইত যাইতেন যাইতে যাইতিস যাইতাম।	৬। যেত যেতেন যেতে যেতিস যেতাম।
৭। যাইতেছিল যাইতেছিলেন যাইতেছিলে যাইতেছিলি যাইতেছিলাম।	৭। যাছিল যাছিলেন যাছিলে যাছিলি যাছিলাম।
৮। গিয়াছিল গিয়াছিলেন গিয়াছিলে গিয়াছিলি গিয়াছিলাম।	৮। গিয়েছিল গিয়েছিলেন গিয়েছিলে গিয়েছিলি গিয়েছিলাম।
৯। যাইবে যাইবেন যাইবে যাইবি যাইব।	৯। যাবে যাবেন যাবে যাবি যাব।
১০। যাইবে যাইবেন যাইও যাইস।	১০। যাবে যাবেন যেও (যেয়ো) যাস।

দ্রষ্টব্য : গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছ, গেছ, যেত, যাছিল, গিয়েছিল, যাব-শব্দগুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদ্বৰ্ণ ই-কার যুক্ত-কিন্ন ঘির, জিত্ ফির, ভিড়, চিন প্রভৃতি লিখ-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। লিখে লিখেন লিখ লিখিস লিখি।	১। লেখে লেখেন লেখ লিখিস লিখি।
২। লিখিতেছে লিখিতেছেন লিখিতেছ লিখিতেছিস লিখিতেছি।	২। লিখছে লিখছেন লিখছ লিখছিস লিখছি।
৩। লিখিয়াছে লিখিয়াছেন লিখিয়াছ লিখিয়াছিস লিখিয়াছি।	৩। লিখেছে লিখেছেন লিখেছ লিখেছিস লিখেছি।
৪। লিখুক লিখুন লিখ লিখ।	৪। লিখুক লিখুন লেখ লেখ।
৫। লিখিল লিখিলেন লিখিলে লিখিলি লিখিলাম।	৫। লিখল লিখলেন লিখলে লিখলি লিখলাম।
৬। লিখিত লিখিতেন লিখিতে লিখিতিস লিখিতাম।	৬। লিখত লিখতেন লিখতে লিখতিস লিখতাম।
৭। লিখিতেছিল লিখিতেছিলেন লিখিতেছিলে লিখিতেছিলি লিখিতেছিলাম।	৭। লিখছিল লিখছিলেন লিখছিলে লিখছিলি লিখছিলাম।
৮। লিখিয়াছিল লিখিয়াছিলেন লিখিয়াছিলে লিখিয়াছিলি লিখিয়াছিলাম।	৮। লিখেছিল লিখেছিলাম লিখেছিলে লিখেছিলি লিখেছিলাম।
৯। লিখিবে লিখিবেন লিখিবে লিখিবি লিখিব।	৯। লিখবে লিখবেন লিখবে লিখবি লিখব।
১০। লিখিবে লিখিবেন লিখিও (লিখিয়ো) লিখিস।	১০। লিখবে লিখবেন লিখো লিখিস।

দ্রষ্টব্য : লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত— শব্দগুলোর উচ্চারণ অ-কারান্ত।

দে (দি) ধাতুর ঝুঁপ

(আদ্যবর্ণ ই-কার যুক্ত – ‘নি’ ইত্যাদি দি-আদিগণ)

সাধু	চণ্ডি
১। দেয় দেন দাও দিস দেই	১। দেয় দেন দাও দিস দি (দিই)
২। দিতেছে দিতেছেন দিতেছ দিতেছিস দিতেছি	২। দিচ্ছে দিচ্ছেন দিচ্ছ দিচ্ছিস দিচ্ছি
৩। দিয়াছে দিয়াছেন দিয়াছ দিয়াছিস দিয়াছি	৩। দিয়েছে দিয়েছেন দিয়েছ দিয়েছিস দিয়েছি
৪। দিক দিন দাও দে	৪। সাধু রীতির মতো
৫। দিল (দিলো) দিলেন দিলে দিলি দিলাম	৫। সাধু রীতির মতো
৬। দিত দিতেন দিতে দিতি দিতাম	৬। সাধু রীতির মতো
৭। দিতেছিল দিতেছিলেন দিতেছিলে দিতেছিলি দিতেছিলাম	৭। দিছিল দিছিলেন দিছিলে দিছিলি দিছিলাম
৮। দিয়াছিল দিয়াছিলেন দিয়াছিলে দিয়াছিলি দিয়াছিলাম	৮। দিয়েছিল দিয়েছিলেন দিয়েছিলে দিয়েছিলি দিয়েছিলাম
৯। দিবে দিবেন দিবি দিব	৯। দেবে দেবেন দিবি দেব
১০। দিবে দিবেন দিও (দিয়ো) দিস	১০। দেবে দেবেন দিও (দিয়ো) দিস

উঠ ধাতুর ঝুঁপ

(আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত – উড়, শুন, পুট, খুঁজ, খুল, দুব, তুল ইত্যাদি উঠ-আদিগণ)

সাধু	চণ্ডি
১। উঠে উঠেন উঠ উঠিস উঠি	১। ওঠে ওঠেন ওঠ উঠিস উঠি
২। উঠিতেছে উঠিতেছেন উঠিতেছ উঠিতেছিস উঠিতেছি	২। উঠছে উঠছেন উঠছ উঠছিস উঠছি
৩। উঠিয়াছে উঠিয়াছেন উঠিয়াছ উঠিয়াছিস উঠিয়াছি	৩। উঠেছে উঠেছেন উঠেছ উঠেছিস উঠেছি
৪। উঠুক উঠুন উঠ উঠ	৪। উঠুক উঠুন ওঠ ওঠ
৫। উঠিল উঠিলেন উঠিলে উঠিলি উঠিলাম	৫। উঠল উঠলেন উঠলে উঠলি উঠলাম
৬। উঠিত উঠিতেন উঠিতে উঠিতিস উঠিতাম	৬। উঠত উঠতেন উঠতে উঠতিস উঠতাম
৭। উঠিতেছিল উঠিতেছিলেন উঠিতেছিলে উঠিতেছিলি উঠিতেছিলাম	৭। উঠছিল উঠছিলেন উঠছিলে উঠছিলি উঠছিলাম
৮। উঠিয়াছিল উঠিয়াছিলেন উঠিয়াছিলে উঠিয়াছিলি উঠিয়াছিলাম	৮। উঠেছিল উঠেছিলেন উঠেছিলে উঠেছিলি উঠেছিলাম
৯। উঠিবে উঠিবেন উঠিবে উঠিবি উঠিব	৯। উঠবে উঠবেন উঠবে উঠবি উঠব
১০। উঠিবে উঠিবেন উঠিও (উঠিয়ো) উঠিস্	১০। উঠবে উঠবেন উঠো উঠিস

দ্রষ্টব্য : উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল-শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

ଶୁ-ଧାତୁ (ଆଦୟବର୍ଣ୍ଣ ଉ-କାର ଯୁକ୍ତ-ଟୁ, ନୁ, ଝୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁ-ଆଦିଗଣ)

ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧। ଶୋଯ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୁସ ଶୁଇ	୧। ଶୋଯ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୁସ ଶୁଇ
୨। ଶୁଇତେହେ ଶୁଇତେହେନ ଶୁଇତେହେ ଶୁଇତେହିସ ଶୁଇତେହି	୨। ଶୁଚେ ଶୁଚେନ ଶୁଚେ ଶୁଚିସ ଶୁଚି
୩। ଶୁଇଯାଛେ ଶୁଇଯାହେନ ଶୁଇଯାଛ ଶୁଇଯାହିସ ଶୁଇଯାହି	୩। ଶୁଯେହେ ଶୁଯେହେନ ଶୁଯେହେ ଶୁଯେହିସ ଶୁଯେହି
୪। ଶୁକ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୋ	୪। ସାଧୁ ରୀତିର ମତୋ
୫। ଶୁଇଲ ଶୁଇଲେନ ଶୁଇଲେ ଶୁଇଲି ଶୁଇଲାମ	୫। ଶୁଲ ଶୁଲେନ ଶୁଲେ ଶୁଲି ଶୁଲାମ
୬। ଶୁଇତ ଶୁଇତେନ ଶୁଇତେ ଶୁଇତିସ ଶୁଇତାମ	୬। ଶୁମ ଶୁତେନ ଶୁତେ ଶୁତିସ ଶୁତାମ
୭। ଶୁଇତେହିଲ ଶୁଇତେହିଲେନ ଶୁଇତେହିଲେ ଶୁଇତେହିଲି ଶୁଇତେହିଲାମ	୭। ଶୁଚିଲ ଶୁଚିଲେନ ଶୁଚିଲେ ଶୁଚିଲି ଶୁଚିଲାମ
୮। ଶୁଇଯାହିଲ ଶୁଇଯାହିଲେନ ଶୁଇଯାହିଲେ ଶୁଇଯାହିଲି ଶୁଇଯାହିଲାମ	୮। ଶୁଯେହିଲ ଶୁଯେହିଲେନ ଶୁଯେହିଲେ ଶୁଯେହିଲି ଶୁଯେହିଲାମ
୯। ଶୁଇବେ ଶୁଇବେନ ଶୁଇବେ ଶୁଇବି ଶୁଇବ	୯। ଶୋବେ ଶୋବେନ ଶୋବେ ଶୁବି ଶୋବୋ
୧୦। ଶୁଇବେ ଶୁଇବେନ ଶୁଇଓ (ଶୁଇଯୋ) ଶୁଇବି	୧୦। ଶୋବେ ଶୋବେନ ଶୁଯୋ ଶୁସ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଶୁଇଛ, ଶୁଇତେହେ, ଶୁଇଯାଛ, ଶୁଯେଛ, ଶୁଇଲ, ଶୁଲ, ଶୁଇତ, ଶୁତ, ଶୁଇତେହିଲ, ଶୁଚିଲ, ଶୁଇଯାହିଲ, ଶୁଯେହିଲ,
ଶୁଇତ- ଶଦ୍ଦଗୁଲୋ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅ-କାରାନ୍ତ |

ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁର ରୂପ

୧। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁର ଚଲିତ ରୂପ ସାଧନେ କଥନୋ ମୂଳ ଧାତୁର ସଙ୍ଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଜକ ରୂପଟି ଯୁକ୍ତ ହ୍ୟ |
ଯେମନ- ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକେ ପଡ଼ିଇଯାହେନ | - ସାଧୁ ରୂପ |

[√ ପଡ଼ + ଆ = ପଡ଼ା (ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ) + ଇଯାହେନ (ବିଭିନ୍ନ)]

ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକେ ପଡ଼ିଯାହେନ - ଚଲିତ ରୂପ |

[√ ପଡ଼ + ୦ (ଅର୍ଥାଏ ପ୍ରୟୋଜକ-ପ୍ରକରଣେର ଆ ଯୁକ୍ତ ହଲୋ ନା) + ଇଯାହେନ = ପଡ଼ିଯାହେନ- ଚଲିତ
ରୂପ] ଚଲିତ ରୂପେ ଆରାଓ କରେକଟି ଧାତୁର ପରିବର୍ତନ ଲକ୍ଷଣୀୟ-

ହ-ଧାତୁ : ଦାଢାଓ, ତୋମାକେ ହେଯାଛି |

ଶିଖ-ଧାତୁ : କେ ତୋମାକେ ଗାନ ଶେଖାଚେ?

ଶୁନ-ଧାତୁ : ଏ କୀ କଥା ଶୋନାଲି ରେ!

**প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি
বর্তমান কাল**

কাল বিভাগ	সে	তিনি	আপনি	তুমি	তুই	আমি
	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত
১। সাধারণ	*য় *য়	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স	*ই *ই	
২। ঘটমান	*ইতেছে *ছে	*ইতেছেন *ছেন	*ইতেছ *ছ	*ইতেছিস *ছিস	*ইতেছি *ছি	
৩। পুরাধিত	*ইয়াছে *ইয়েছে	*ইয়াছেন *ইয়েছেন।	*ইয়াছ *ইয়েছ	*ইয়াছিস *ইয়েছিস	*ইয়াছি *ইয়েছি।	
৪। অনুজ্ঞা	*উক *ক	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স		

অতীত কাল

৫। সাধারণ	*ইল *লো	*ল	*ইলেন *লেন	*লেন	*ইলে *লে	*লি	*ইলাম *লাম
৬। নিত্যবৃত্ত	*ইত *তো	*ত	*ইতেন *তেন	*তেন	*ইতে *তে	*তিস *তিস	*ইতাম *তাম
৭। ঘটমান	*ইতেছিল ০ ইয়েছিল	*ছিল	*ইতেছিলেন ০ ইয়েছিলেন	*ছিলেন	*ইতেছিলে ০ ইয়েছিলে	*ইতিছিলি ০ ইয়েছিলি	*ছিলি ০ ইয়েছিলাম *ছিলাম
৮। পুরাধিত	*ইয়াছিল ০ ইয়েছিল		*ইয়াছিলেন ০ ইয়েছিলেন		*ইয়াছিলে ০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি ০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম ০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	*ইবে *বে	*বে	*ইবেন *বেন	*বেন	*ইবে *বে	*ইবি *বি	*ইব*ব *বো
১০। অনুজ্ঞা	*উক ০ উক	*ক	*বেন ০ বেন	*বেন	*ইও ০ যো	*সু ০ স	

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ-কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থলে হবে না।

‘କର’ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଜକ ରୂପ

କାଳ	ମେ		ତିନି		ଆପନି		ତୁମି		ତୁହି		ଆମି	
	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧। ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଯ	କରାଯ	କରାନ	କରାନ	କରାଓ	କରାଓ	କରାଇସ	କରାସ	କରାଇ	କରାଇ		
୨। ଘଟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଇତେହେ	କରାଛେ	କରାଇତେହେନ	କରାଛେନ	କରାଇତେହ	କରାଛ	କରାଇତେହିସ	କରାଛିସ	କରାଇତେହି	କରାଛି		
୩। ପୁରାଘଟିତ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଇଯାହେ	କରାଯେହେ	କରାଇଯାହେନ	କରାଯେହେନ	କରାଇଯାଛ	କରିଯେଛ	କରାଇଯାହିସ	କରିଯେହିସ	କରାଇଯାଛି	କରିଯେଛି		
୪। ଅନୁଜ୍ଞା/ଆକାଙ୍କ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାକ	କରାକ	କରାନ	କରାନ	କରାଓ	କରାଓ	କରାଇସ	କରାସ	କରାଇ	କରାଇ		
୫। ସାଧାରଣ ଅତୀତ	କରାଇଲ	କରାଲ	କରାଇଲେନ	କରାଲେନ	କରାଇଲେ	କରାଲେ	କରାଇଲି	କରାଲି	କରାଇଲାମ	କରାଲାମ		
୬। ନିତ୍ୟବୃତ୍ତ ଅତୀତ	କରାଇତ	କରାତ	କରାଇତେନ	କରାତେନ	କରାଇତେ	କରାତେ	କରାଇତିସ	କରାତିସ	କରାଇତାମ	କରାତାମ		
୭। ଘଟମାନ ଅତୀତ	କରାଇତେହିଲ	କରାଛିଲ	କରାଇତେହିଲେନ	କରାଛିଲେନ	କରାଇତେହିଲେ	କରାଛିଲେ	କରାଇତେହିଲି	କରାଛିଲି	କରାଇତେହିଲାମ	କରାଛିଲାମ		
୮। ପୁରାଘଟିତ ଅତୀତ	କରାଇଯାହିଲ	କରିଯେହିଲି	କରାଇଯାହିଲେନ	କରିଯେହିଲେନ	କରାଇଯାହିଲେ	କରିଯେହିଲେ	କରାଇଯାହିଲି	କରିଯେହିଲି	କରାଇଯାହିଲାମ	କରିଯେହିଲାମ		
୯। ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟৎ	କରାଇବେ	କରାବେ	କରାଇବେନ	କରାବେନ	କରାଇବେ	କରାବେ	କରାଇବି	କରାବି	କରାଇବ	କରାବ		
୧୦। ଭବିଷ୍ୟৎ ଅନୁଷ୍ଠାନ	କରାକ	କରାକ	କରାନ	କରାନ	କରାଇଓ	କରାଯୋ	କରାଇସ	କରାସ				

ପରିଶିଷ୍ଟ : ଧାତୁର ଚଲିତ ରୂପ ସାଧନେ କତିପାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ

୧. ମୂଳସର ଅ-କାରାନ୍ତ

କହୁ ଧାତୁ : କହିତାମ, କହିଲାମ, କହିତି, କହିତିସ, କହେହିସ ଇତ୍ୟାଦି ।

୨. ମୂଳସର ଆ-କାରାନ୍ତ

(କ) **ଆ-ଧାତୁ :** ଖେଲାମ (ଆଇଲାମ), ଖେଲେନ (ଆଇଲେନ), ଖେଲ, ଖେଲେ, (ଆଇଲ), ଖେଯେହେ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଖ) **ସା-ଧାତୁ :** ଗେଲ (ସାଇଲ), ଗିଯେହିଲ, ସେତ-ସେତୋ (ସାଇତ), ସେତେହିଲ, ସାଛିଲ (ସାଇତେହିଲ) ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଗ) **ଗାହୁ (ଗୈ)-ଧାତୁ :** (ଚଲିତ ରୂପ)- ଗାହିତ, ଗାଇଲାମ, ଗେଯେହି, ଗେଯେହିଲାମ, ଗେଯେହେ, ଗାଇଲେ, ଗାହିତିସ, ଗାହିହିସ, ଗାହିବେ, ଗାବେ, ଗାହିବ, ଗାବ ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ମୂଳସର ଇ ବା ଈ-କାରାନ୍ତ : ଶିଥ୍ ଧାତୁ (ଚଲିତ ରୂପ)-ଶେଖୋ, ଶେଖେନ, ଶେଖେ (ଶିଥେ), ଶିଥିସ, ଶିଥଲାମ, ଶେଖ ଇତ୍ୟାଦି ।

୪। **ମୂଳସର ଉ-କାରାନ୍ତ :** ଶୁନ୍ ଧାତୁ- ଶୋନୋ, ଶୋନେନ, ଶୋନେ, ଶୁନଲାମ, ଶୁନେହି, ଶୁନତାମ, ଶୁନେହିସ, ଶୋନାଓ ଇତ୍ୟାଦି ।

୫। **ମୂଳସର ଏ-କାରାନ୍ତ :** ଦେ, (ଦି) ଧାତୁ-ଦିଇ, ଦେଯ, ଦେନ, ଦିନ, ଦାଓ, ଦିଲାମ, ଦିଯେହିଲାମ, ଦିତାମ (ଦିତୁମ), ଦେବ (ଦେବୋ), ଦିଚେ, ଦିଚ୍ଛିଲୁମ, ଦାଓ, ଦେ, ଦିନ, ଦିକ, ଦିଯୋ (ଦିବୋ) ଇତ୍ୟାଦି ।

୬। **ମୂଳସର ଓ-କାରାନ୍ତ :** ଧୋ-ଧାତୁ-ଧୋଯ, ଧୋନ, ଧୋଓ, ଧୁଛିସ, ଧୁଇବି, ଧୁଯେହି, ଧୋସ, ଇତ୍ୟାଦି । ବାକି ସବଗୁଲୋ ଉ-କାର ଯୁକ୍ତ ଧାତୁର ରୂପେର ନ୍ୟାୟ ।

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বস্থনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

- (ক) মূলস্বর অ-কারান্ত : ‘হ’ – হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলাম), হওয়াছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।
- (খ) মূলস্বর ই-ঈ-কারান্ত : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই-কারান্ত এবং কখনো এ-কারান্ত হয়। যেমন – (সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ সাধন : শিখাই-শেখাই-শিখুই। শেখাও-শিখোও। শেখালুম-শিখোলুম। শেখালে-শিখোলে। শেখাতুম-শিখোতুম। শেখাতিস-শিখেতিস। শেখাত-শিখোতো। শেখাবি-শিখোবি। শিখাছি-শিখেছি (শিখাছি)। শেখাচ্ছে-শিখুচ্ছে। শেখাছিল-শিখেছিল। শেখাও-শেখোও। শেখ-শিখো।

- (গ) মূলস্বর উ-কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বস্থনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন-ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায (শুনোয)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস-শুনোতিস-শুনুতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাছ (শুনাছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহা! কী হওয়াটাই না তুমি হওয়ালে। দাঁড়াও তোমাকে শেখাছি। তুই আর আমাকে কী শিখুবি? রোজ তোমাকে কত রূপকথা শোনাই। ‘কী কথা শুনাণি মোরে’। ওকে তুমি কী শুনাছ?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন –

১. √আ-আইল>এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ – (বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
- ৩। নহ ধাতু-(বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
- ৪। বট ধাতু – (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
- ৫। থাক্ (রহ) ধাতু (বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রও), থাকিস, (রস, রোস, রাইস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম-রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন : ‘কোথাকার জানুকর এলি এখানে।’ ‘আইল রাক্ষসকূল প্রভঙ্গন বেগে।’ কেমন আছিস? কোথায় ছিলি? সে ব্যক্তিটি তুমি নও। ‘একা দেখি কুলবধু, কে বট আপনি? ‘আজি ঘরে একলাটি পারবো না রইতে।’ রোসো, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। ‘হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।’

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উভর দেওয়া হয়েছে। ঠিক উভরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

(ক) বাংলা ভাষার ধাতুর রূপ কয়টি?

ক. ১৮টি

খ. ২০টি

গ. ১৯টি

ঘ. ২১টি

(খ) কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু উঠ-আদি গণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শুন্ খুঁজ, দুব,, তুস্

খ. সহ, কহ, বস্, শুন্,

গ. লিখ, কিন্ত, বাহ, দুব

ঘ. কিহ, দুব, লিখ, শুন্

(গ) কর-ধাতুর উভম পুরুষ পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ কোনটি?

ক. করতাম

খ. করিয়াছিলাম

গ. করিতাম

ঘ. করেছিলাম

(ঘ) যা-ধাতুর মধ্যম পুরুষ নিত্যবৃত্ত অতীতের চলিত ভাষার রূপ কোনটি?

ক. গিয়েছিলে

খ. যেতে

গ. যাচ্ছিলি

ঘ. যাইত

(ঙ) দে-ধাতুর প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমানের চলিত রীতির রূপ কোনটি?

ক. দিতেছে

খ. দিত

গ. দিচ্ছে

ঘ. দিয়েছিল

(চ) কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু অসম্পূর্ণ ধাতু?

ক. $\sqrt{\text{আ}}, \sqrt{\text{বট}}, \sqrt{\text{শিখ}}, \sqrt{\text{যা}}$

খ. $\sqrt{\text{আছ}}, \sqrt{\text{তা}}, \sqrt{\text{শিখ}}, \sqrt{\text{যা}}$

গ. $\sqrt{\text{আ}}, \sqrt{\text{থাক}}, \sqrt{\text{আছ}}, \sqrt{\text{বট}}$

ঘ. $\sqrt{\text{থাক}}, \sqrt{\text{বট}}, \sqrt{\text{আ}}, \sqrt{\text{শিখ}}$

(ছ) প্রযোজক যা-ধাতুর পুরাঘটিত অতীত কালের প্রথম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. গেল

খ. গিয়াছিল

গ. যেত

ঘ. গিয়েছিল

(ঝ) নতুন ধাতুর সাধারণ বর্তমান উভয় পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি

খ. নহে

গ. নই

ঘ. নয়

- ২। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর দুটো করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নামধাতু বলতে কী বোঝ? নামধাতু কীভাবে গঠিত হয়, বাকেয় এর ব্যবহার দেখাও।
- ৪। সংজ্ঞা লেখ এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।
গিজন্ত ধাতু, অসম্পূর্ণ ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু
- ৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর সাথু ও চলিত রূপ লেখ।
বল, শিখ, দে, শুন, যা, কহ, পড়, লিখ।
- ৬। শুন-ধাতুর গিজন্ত-প্রকরণের রূপগুলো লেখ।
- ৭। বাকেয় প্রয়োগ দেখাও।
 - (ক) তিনটি ঘটমান কালের গাহ ধাতু।
 - (খ) কর-ধাতুর ভবিষ্যৎ গিজন্ত রূপ।
 - (গ) গাহ-ধাতুর বর্তমান কালের চলিত রূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক : ‘কারক’ শব্দটির অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারক হয় প্রকার :

- | | |
|--------------|-------------------|
| ১. কর্তৃকারক | ৪. সম্প্রদান কারক |
| ২. কর্ম কারক | ৫. অপাদান কারক |
| ৩. করণ কারক | ৬. অধিকরণ কারক |

একটি বাক্যে ছয়টি কারকের উদাহরণ–

* বেগম সাহেবা প্রতিদিন ডাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

এখানে

১.	বেগম সাহেবা	—	ক্রিয়ার	সঙ্গে	কর্তৃসম্বন্ধ
২.	চাল	—	”	”	কর্ম সম্বন্ধ
৩.	হাতে	—	”	”	করণ সম্বন্ধ
৪.	গরিবদের	—	”	”	সম্প্রদান সম্বন্ধ
৫.	ডাঁড়ার থেকে	—	”	”	অপাদান সম্বন্ধ
৬.	প্রতিদিন	—	”	”	অধিকরণ সম্বন্ধ

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + o বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ + o বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।

বাংলা শব্দ-বিভক্তি

০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ-বিভক্তি), এ, (য়), তে (এ), কে, (ৱে,) র, (এরা) – এ কয়টিই খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তি। এ ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক-সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন-দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

একবচন এবং বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

বিভক্তির আকৃতি

একবচন

প্রথমা : o, অ, এ, (য়), তে, এতে।

দ্বিতীয়া : o, অ, কে, রে (এরে), এ, য, তে।

তৃতীয়া : o, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।

চতুর্থী : দ্বিতীয়ার মতো।

পঞ্চমী : এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে। দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।

ষষ্ঠী : র, এর।

সপ্তমী : এ, (য়), য, তে, এতে।

বহুবচন

রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।

দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।

দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, * গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, * দের দিয়ে।

দ্বিতীয়ার মতো।

দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।

*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।

দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বন্ধনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

(ক) অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ‘রা’ যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয় যেমন—পাথরগুলো, গরুগুলি।

(খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উভর ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা—কলম দাও।

(গ) স্বরান্ত শব্দের উভর ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয়—‘য়’ বা ‘য়ে’। ‘এ’ স্থানে ‘তে’ বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।

যেমন—মা+এ =মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।

(ঘ) অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উভর প্রায়ই ‘রা’ স্থানে ‘এরা’ হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির ‘র’ স্থলে ‘এর’ যুক্ত হয়। যেমন—লোক + রা = লোকেরা। বিদ্যান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদ্যানেরা। মানুষ + এর = মানুষের। লোক + এর = লোকের। কিন্তু অ-কারান্ত, আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত খাটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ ‘র’ যুক্ত হয়, ‘এর’ যুক্ত হয় না। যেমন—বড়, মামার, ছেলের।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্বন্ধ করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে ‘কে’ বা ‘কারা’ যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা—ই কর্তৃকারক। যেমন— খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা— কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা— কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে :

১. মুখ্য কর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন— ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুশলধারে বৃক্ষ পড়ছে।
২. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্বন্ধ করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন— শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
৩. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। উপরের বাক্যে ‘ছাত্র’ প্রযোজ্য কর্তা।

তদুপ— রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন—

বাষ্পে—মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

রাজায়—রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশতত্ত্ব অনুসারে কর্তা তিনি রকম হতে পারে। যেমন—

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দারা চোর ধূত হয়েছে।
২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।
৩. কর্ম—কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি | : হামিদ বই পড়ে। |
| খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি | : বশিরকে যেতে হবে। |
| গ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি | : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে। |
| ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি | : আমার যাওয়া হয়নি। |

(ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : গীঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।
 বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সন্তানে।
 পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।
 বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

য়-বিভক্তি : ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
 তে-বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়।
 বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন-

বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

- ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।
- খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
- গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক শূম ঘূমিয়েছি।
- ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন-

দুখকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুখ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ডাঙ্কার ডাক।
 আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
 রবিশূন্নাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।
 (গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)

- (খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : তাকে বল।
 আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

- (গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : তোমার দেখা পেলাম না।
 (ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : ‘জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।’ (বীক্ষায়)

করণ কারক

‘করণ’ শব্দটির অর্থ : যত্ন, সহায়ক বা উপায়।

ক্রিয়া সম্পাদনের যত্ন, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘কীসের দ্বারা’ বা ‘কী উপায়ে’ প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, তা-ই করণ কারক। যেমন –

নীরা কলম দিয়ে লেখে। (উপকরণ – কলম)

‘জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।’ (উপায় – সাধনা)

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা বল খেলে। (অকর্মক ক্রিয়া)
 ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)
- (খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।
- দিয়া বিভক্তি : মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।
- (গ) সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।
 শিকারি বিড়াল শৌকে চেনা যায়।
- তে বিভক্তি : ‘এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
 তবু যেন তা মধুতে মাখা।’ – নজরুল।
 লোকটা জাতিতে বৈক্ষণ।
- য বিভক্তি : চেষ্টায় সব হয়।
 এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়— ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।

(অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।)

সম্পদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্নির ব্যবহার

(ক) চতুর্থী বা কে বিভিন্নি : শিখাইকে তিক্ষা দাও। (স্বত্ত্বত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন – ধোপাকে কাপড় দাও।)

(খ) সপ্তমী বা এ বিভিন্নি : সৎপাত্রে কন্যা দান কর। সমিতিতে চাঁদা দাও। ‘অন্ধজনে দেহ আলো’।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে ‘কে’ বিভিন্নি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভিন্নি হয়। যেমন–‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।’

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরঞ্জ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন–

বিচ্যুত : গাছ থেকে পাতা পড়ে।
মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

গৃহীত : সুস্তি থেকে মুক্তো মেলে।
দুখ থেকে দই হয়।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
খেজুর রসে গুড় হয়।

বিরত : পাপে বিরত হও।

দূরীভূত : দেশ থেকে পঞ্জাপাল চলে গেছে।

রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরঞ্জ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্নির ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্নির প্রয়োগ

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভিন্নি : বৌটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।’
‘মনে পড়ে সেই জৈয়ষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।’

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভিন্নি : বাবাকে বড় ভয় পাই।

(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভিন্নি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সম্মে হয়।

(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভিন্নি : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।

য বিভিন্নি : টাকায় টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদনের ব্যবহার

- (ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।
- (খ) দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
- (গ) নিষ্কেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সম্মত অর্থাৎ ‘এ’ ‘য়’ ‘তে’ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-

- আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।
- কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- অধিকরণ তিনি প্রকার : ১. কালাধিকরণ।
২. আধারাধিকরণ।
৩. ভাবাধিকরণ।

যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সম্মত বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সম্মত বলা হয়। যেমন –

সুর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কানায় শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ তিনি ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক, ২. অভিব্যাপক এবং ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন –

পুকুরে মাছ আছে। (পুকুরের যে কোনো একস্থানে)

বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)

আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন–

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী,

ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে), রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।

২. অভিব্যাপক : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন–

তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)

নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে।)

৩. বৈষম্যিক : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষম্যিক অধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই।
- (খ) তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ থাবে।
- (গ) পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
- (ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্ণের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

পরিশিষ্ট

১। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে – রহিম বাড়ি যায়।
- (খ) কর্মকারকে – ডাক্তার ডাক।
- (গ) করণে – ঘোড়াকে চাবুক মার।
- (ঘ) অপাদানে – গাড়ি স্টেশন ছাড়।
- (ঙ) অধিকরণে – সারারাত বৃক্ষ হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বা এ বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে – লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।
- (খ) কর্মকারকে – এ অধীনে দায়িত্বার অর্পণ করুন।
- (গ) করণে – এ কলমে ভালো লেখা হয়।
- (ঘ) অপাদানে – ‘আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাখবে?’
- (ঙ) অধিকরণে – এ দেহে প্রাণ নেই।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন— মতিনের ভাই বাড়ি যাবে।

এখানে ‘মতিনের’ সঙ্গে ‘ভাই’—এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু ‘যাবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)

কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু ‘কাল’ শব্দের উত্তর শুধু ‘এর’ বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন—

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| (ক) অধিকার সম্বন্ধ | : | রাজাৱ রাজ্য, প্ৰজাৱ জমি। |
| (খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ | : | গাছেৱ ফল, পুকুৱেৱ মাছ। |
| (গ) কাৰ্য্যকাৱণ সম্বন্ধ | : | অগ্ৰিৱ উভাপ, ৱোগেৱ কষ্ট। |
| (ঘ) উপাদান সম্বন্ধ | : | বৃপার থালা, সোনার বাটি। |
| (ঙ) গুণ সম্বন্ধ | : | মধুৱ মিষ্টতা, নিমেৱ তিক্ততা। |
| (চ) হেতু সম্বন্ধ | : | ধনেৱ অহংকাৱ, বুপেৱ দেমাক। |
| (ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ | : | ৱোজাৱ ছুটি, শৱতেৱ আকাশ। |
| (জ) ক্রম সম্বন্ধ | : | শাচেৱ পৃষ্ঠা, সাতেৱ ঘৰ। |
| (ঝ) অংশ সম্বন্ধ | : | হাতিৱ দাঁত, মাথাৱ চুল। |
| (ঝঃ) ব্যবসায় সম্বন্ধ | : | পাটেৱ গুদাম, আদাৱ ব্যাপারি। |
| (ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ | : | একেৱ তিন, সাতেৱ পাঁচ। |
| (ঠ) কৃতি সম্বন্ধ | : | নজুলেৱ ‘অগ্ৰিবীণা’ মাইকেলেৱ ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। |
| (ড) আধাৱ-আধেয় | : | বাটিৱ দুধ, শিশিৱ ওষুধ। |
| (ঢ) অভেদ সম্বন্ধ | : | জ্ঞানেৱ আলোক, দুঃখেৱ দহন। |

(গ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ	:	ননীর পুতুল, শোহার শরীর।
(ত) বিশেষণ সম্বন্ধ	:	সুখের দিন, ঘোবনের চাঞ্চল্য।
(থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ	:	সবার সেরা, সবার ছেট।
(দ) কারক সম্বন্ধ	:	(১) কর্তৃ সম্বন্ধ — রাজার হুকুম। (২) কর্ম সম্বন্ধ — প্রতুর সেবা, সাধুর দর্শন। (৩) করণ সম্বন্ধ — চোখের দেখা, হাতের লাঠি। (৪) অপাদান সম্বন্ধ — বাঘের তয়, বৃক্ষের পানি। (৫) অধিকরণ সম্বন্ধ — ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

সম্বোধন পদ

‘সম্বোধন’ শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন— ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন— ‘ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।’ ‘ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’ ‘অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?’
২. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।
৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্যসূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্যসূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন— ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

অনুশীলনী

- ১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উভয় দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তম উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) কোন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন

গ. বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না

খ. রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে

ঘ. তোমাকে পড়তে হবে

(২) কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ক. শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন | গ. তারা বল খেলে |
| খ. ডাক্তার ডাক | ঘ. আমি ঢাকা যাচ্ছি |

(৩) কোন বাক্যটিতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ক. তেলাপোকাকে তয় পাই | গ. ভিক্ষুককে দান কর |
| খ. তাকে ডেকে আন | ঘ. ‘বেলা যে পড়ে এল জলকে চল’ |

(৪) কোন বাক্যে ভাবে সপ্তমী-র প্রয়োগ রয়েছে?

- | | |
|--|--------------------------|
| ক. সূর্যাস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয় | গ. ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর’ |
| খ. লোকে কত কথা বলে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

(৫) কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ক. আমি স্কুলে যাচ্ছি | গ. ছেলেরা মাঠে বল খেলে |
| খ. সে ঢাকা যাবে | ঘ. তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক |

(৬) কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ক. সে গ্রামে যাবে | গ. ছুটি হলে ঘণ্টা বাজে |
| খ. তাকে গ্রামে যেতে হবে | ঘ. আমার যাওয়া হবে না |

(৭) কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ক. তাকে আমরা চিনি না | গ. ‘জিজ্ঞাসিব জনে জনে’ |
| খ. ‘দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি’ | ঘ. লাঙল দারা জমি চাষ করা হয় |

(৮) কোন বাক্যে কর্তায় এ-বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ক. পাগলে কী না বলে | গ. ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে |
| খ. বনে বাঘ আছে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

২। কারক বলতে কী বোঝ? কারক নির্বাচনে শব্দ বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলা শব্দ বিভক্তিগুলোর নাম লেখ এবং বচন অনুসারে তাদের সাজাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ----- বিভক্তি যুক্ত হয় না।
- খ. স্বরাস্ত শব্দের উভর ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয় ‘য়’ অথবা -----।
- গ. বাংলা শব্দে, অ, আ এবং এ-কারাস্ত শব্দে ষষ্ঠীর এক বচনে শুধু ‘র’ যুক্ত হয়, --- যুক্ত হয় না।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

- (ক) প্রযোজক কর্তা (খ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (গ) বিধেয় কর্ম (ঘ) ভাবে সম্পত্তী
- (ঙ) গৌণ কর্ম (চ) অভিব্যাপক অধিকরণ (ছ) নামধাতুজ কর্মকারক।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

- (১) আজ আর আমার যাওয়া হবে না।
- (২) গোয়ালা গুরু দোহন করে।
- (৩) নিজের চের্টায় বড় হও।
- (৪) শিকারি বিড়াল গৌফে চেনা যায়।
- (৫) বাবাকে বড় ভয় পাই।
- (৬) বোটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
- (৭) লোকটা কান্নায় ভেজো গড়ল।

৭। বাক্যে উদাহরণ দাও।

- (ক) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি
- (খ) অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি
- (গ) করণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি
- (ঘ) কর্তৃকারকে ‘তে’ বিভক্তি

৮। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেখিয়ে বাক্য গঠন কর।

৯। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় কিনা, উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

১০। খাঁটি বাংলা সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা কর।

১১। বিভিন্ন কারকে সম্পত্তী বিভক্তির ব্যবহার দেখাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা ‘কে’ এবং ‘র’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন—

বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)

সনে : ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার ‘কে’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন—

প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, উপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, তিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতর ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিগুলো ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

১. বিনা/বিনে : কর্তৃ কারকের সঙ্গে – তুমি বিনা (বিনে) আমার কে আছে?
- বিনি : করণ কারকের সঙ্গে – বিনি সুতায় গাঁথা মালা।
- বিহনে : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
২. সহ : সহগামিতা অর্থে – তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
- সহিত : সমসূত্রে অর্থে – শত্রুর সহিত সম্পর্ক চাই না।
- সনে : বিরুদ্ধগামিতা অর্থে – ‘দশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গা যুবে ভুজঙ্গা সনে।’
- সঙ্গে : তুলনায় – মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।
৩. অবধি : পর্যন্ত অর্থে – সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
৪. পরে : সংজ্ঞ বিরতি অর্থে – এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
- পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে – শরতের পরে আসে বসন্ত।

৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে – ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন।
 ‘শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।’
৬. মতো : ন্যায় অর্থে – বেকুবের মতো কাজ করো না।
 তরে : মত অর্থে – এ জন্মের তরে বিদ্যায় নিশাম।
৭. পক্ষে : সক্ষমতা অর্থে – রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।
 সহায় অর্থে – আসামির পক্ষে উকিল কে?
৮. মাঝে : মধ্যে অর্থে – ‘সীমার মাঝে অসীম ভূমি’।
 একদেশিক অর্থে – এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।
 ক্ষণকাল অর্থে – নিমেষ মাঝেই সব শেষ।
- মাঝারে : ব্যাস্তি অর্থে – ‘আছ ভূমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’
৯. কাছে : নিকটে অর্থে – আমার কাছে আর কে আসবে?
 কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে – ‘রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।’
১০. প্রতি : প্রত্যেক অর্থে – মণ্থন পাঁচ টাকা লাভ দেব।
 দিকে বা ওপর অর্থে – ‘নিদারূণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।’
১১. হেতু : নিমিস্ত অর্থে – ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’
 জন্মে : নিমিস্ত অর্থে – ‘এ ধন-সম্পদ তোমার জন্মে।’
 সহকারে : সঙ্গে অর্থে – আগ্রহ সহকারে কহিলেন।
 বশত : কারণে অর্থে – দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোত্তমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে

গ. শব্দের মধ্যে

খ. শব্দের পরে

ঘ. বাক্যের শেষে

(২) অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ-বিভক্তি

গ. উপসর্গ

খ. ক্রিয়া-বিভক্তি

ঘ. অব্যয়

(৩) ‘শরতের পর আসে বসন্ত’। এখানে ‘পর’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি

গ. বিরতি

খ. অল্প বিরতি

ঘ. নৈকট্য

(৪) ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’ – ‘হেতু’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার

গ. নিমিত্ত

খ. প্রার্থনা

ঘ. প্রসঙ্গ

(৫) এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে ‘মাঝে’–অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র

গ. মধ্যে

খ. একদেশিক

ঘ. ব্যাপ্তি

(৬) তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া। –এখানে ‘তরে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত

গ. মধ্যে

খ. নিকট

ঘ. নিমিত্ত

(৭) ‘দংশনক্ষত শ্যেন বিহজ্ঞ যুবে ভুজজা সনে।’–এখানে ‘সনে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা

গ. প্রতি

খ. সঙ্গে

ঘ. হেতু

(৮) ‘বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা’। – এখানে ‘বিনে’ কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে

গ. ব্যতিরেকে

খ. প্রয়োজন

ঘ. আবশ্যিকতা

(৯) ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’ – এখানে ‘মাঝারে’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে

গ. মধ্যে

খ. ব্যাপ্তি

ঘ. সঙ্গে

(১০) অনুসর্গ কী করে?

ক. বিভক্তির কাজ করে

গ. শব্দের অর্থ স্পষ্টতর করে

খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে

ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে

২। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বল।

৩। অনুসর্গ এবং থাটি বাংলা শব্দ বিভক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

৪। বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুসর্গ কারক-বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে স্থূলাক্ষরে লিখিত অনুসর্গগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রতিটি বাক্যের ডান দিকে লেখ।

(ক) শরতের পুর আসে হেমন্ত।

(খ) বেকুবের মতো বলেছ।

(গ) গরিবের পক্ষে কথা বলার লোক নেই।

(ঘ) সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।

(ঙ) মায়ের কাছে কথাটি শুধাব।

(চ) ‘নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিরাট উল্লাসে।

সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।

(ছ) ওর সনে আমার আড়ি।

(জ) মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।

(ঝ) ‘সকলের তরে সকলে আমরা,

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য প্রকরণ

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্য থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন –

- (১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসন্তি এবং (৩) যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন – ‘চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চারদিকে’- এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চারদিকে ঘোৱে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নির্বাচন হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসন্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রহণ না হয়। বাক্যের অর্থসংজ্ঞাতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসন্তি। যেমন –

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসন্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিতি পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন – বর্ষার বৃক্ষিতে প্লাবনের সূক্ষ্ম হয়। – এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

কিন্তু ‘বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সূক্ষ্ম করে।’ – বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সূক্ষ্ম করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

(ক) গীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে গীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

শব্দ	রীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগ্রহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয় বিশেষ কোনো শস্যের রস	তিল + ফ	তিলজাত মেহ পদার্থ

(খ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন – তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মাঝা অর্থে, কিন্তু বাংলা ‘প্রপঞ্চ’ শব্দটি অপ্রচলিত)।

(গ) উপমার ভূল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন –

আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেত্রে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) বাহুল্য–দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। ‘আলেমগণ’ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে ‘সব’ শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য–দোষ সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন – ‘অরণ্যে রোদন’ (অর্থ : নিষ্কাল আবেদন)–এর পরিবর্তে যদি বলা হয়।, ‘বনে ক্রস্নন’ তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

(চ) গুরুচন্দ্রলী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচন্দ্রলী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। ‘গুরুর গাড়ি’, ‘শবদাহ’, ‘মড়াপোড়া’ প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে ‘গুরু’ শক্ট’, ‘শবপোড়া’, ‘মড়াদাহ’ প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচন্দ্রলী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন –

খোকা এখন (উদ্দেশ্য)	বই পড়ছে (বিধেয়)
------------------------	----------------------

বিশেষ বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন –

- সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী। – বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ।
- মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়। – ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ:	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
১. বিশেষণ যোগে-	কুখ্যাত	দস্যদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে-	হাসিমের	তাই	এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে-	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	তারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে-	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে-	যার কথা তোমরা বলে থাক,	তিনি	এসেছেন।
বিধেয়ের সম্প্রসারণ:	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে-	ঘোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে-	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে-	ভুবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে-	তিনি	যে ভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে-	ইনি	আমার বিশেষ	অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিনি প্রকার : (১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা – পুরুরে পদ্ধফুল জন্মে। এখানে ‘পদ্ধফুল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়।

এ রকম : বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহয়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিদ্যালয় মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরম্পর সাপেক্ষে তাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা—

আশ্রিত বাক্য প্রধান খণ্ডবাক্য

- যে পরিশ্রম করে,
- সে—ই সুখ লাভ করে।
- সে যে অপরাধ করেছে,
- তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিনি প্রকার : (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য (Noun clause) : যে আশ্রিত খন্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খন্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য বলে। যথা :

—আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খন্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)

তদুপ : তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ধাঁটাধাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য (Adjective clause) : যে আশ্রিত খন্ডবাক্য প্রধান খন্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য বলে। যথা :

—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি ‘সেই’ সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

তদুপ : ‘ধাটি সোনার চাইতে ধাটি, আমার দেশের মাটি’।

‘ধনধান্য পুক্ষে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।’

যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগ।

গ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খন্ডবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খন্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য বলে। যেমন —

‘যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।’

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।

যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য : যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন —

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বন্ত্র মণিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধোত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারাস্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

১. সরল বাক্য : ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. সরল বাক্য : তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
৩. সরল বাক্য : তিক্ষ্ণকে দান কর।
মিশ্র বাক্য : যে তিক্ষ্ণা চায়, তাকে দান কর।

খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর : মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

১. মিশ্র বাক্য : যদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য : নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
২. মিশ্র বাক্য : যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ খণ্ড স্বীকার করব।
সরল বাক্য : আজীবন এ খণ্ড স্বীকার করব।
৩. মিশ্র বাক্য : যে সকল পশু মাস্স ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল বাক্য : মাস্সতোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

১. সরল বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাঢ়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাঢ়ি যেতে বললেন।
২. সরল বাক্য : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
৩. সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে

- (১) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- (২) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
- (৩) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
- (৪) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

(১) যৌগিক বাক্য	:	সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য	:	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
(২) যৌগিক বাক্য	:	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য	:	তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।
(৩) যৌগিক বাক্য	:	মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য	:	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

ঙ. যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে ‘যদি’ কিংবা ‘যদিও’ এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে ‘তাহলে’ (তাহা হইলে) কিংবা ‘তথাপি’ অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) যৌগিক বাক্য	:	দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য	:	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
(২) যৌগিক বাক্য	:	তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য	:	যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা :

যৌগিক বাক্য	:	এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য	:	এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

চ. মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) মিশ্র বাক্য	:	যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য	:	সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
(২) মিশ্র বাক্য	:	যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য	:	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
(৩) মিশ্র বাক্য	:	যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য	:	তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা : বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য বিশ্লেষণ বলে।

ক. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সৎসার ত্যাগ করেন।

২. ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা) দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন।

উপরে লিখিত বাক্য দুটিকে (১) উদ্দেশ্য, (২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, (৩) বিধেয়, (৪) বিধেয়ের সম্প্রসারক – এ চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
(১) মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র	শাক্যসিংহ	যৌবনে সৎসার	ত্যাগ করেন।
(২) ইসলামের প্রথম খলিফা	হজরত আবু বকর (রা)	দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব	দান করেছিলেন।

খ. মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. খন্ডবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান এবং অপ্রধান খন্ডবাক্যের মধ্যে কোনো সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন–আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য–(১) আমি স্থির করলাম; সংযোজক পদ–যে; বিশেষ্য–স্থানীয় খন্ডবাক্য – (২) অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়
(১)	আমি	অল্প বয়স্ক বালককে	স্থির করলাম	যে
(২)	(আমি) (উহ্য)		পাঠাব না।	এবং

গ. যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।
২. কোনো সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন – ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দুটি বাক্য আছে। যেমন –
 - (১) ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।
 - (২) জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দুটির সংযোজক অব্যয় ‘এবং’।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক অব্যয়
(১)	ত্যাগ	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	এবং
(২)	জ্ঞান	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	

বাক্য সংক্ষেপণ

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর। এখানে বাক্য সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বাক্য সংক্ষেপণের বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ

অকালে পক্ষ হয়েছে যা – অকালপক্ষ।

অক্ষির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – অনভিজ্ঞ।

অহংকার নেই যার – নিরহংকার।

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম।

অনুত্তে (বা পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোগান্ত।

আকাশে বেড়ায় যে – আকাশচারী, খেচর।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার – আচারনিষ্ঠ।

আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা – আআকেন্দ্রিক।

আপনাকে যে পঞ্চিত মনে করে – পঞ্চিতম্বন্য।

আন্তর্ভুক্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – আস্তিক।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক।
 ইতিহাস রচনা করেন যিনি – ঐতিহাসিক।
 ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা।
 ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়।
 ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার – আঁষটে।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না – অকৃতজ্ঞ।
 উপকারীর অপকার করে যে – কৃতয়।
 একই মাতার উদরে জাত যে – সহোদর।
 এক থেকে শুরু করে ভূমাগত – একাদিক্রমে।
 কর্ম সম্পাদনে পরিশৰ্মী – কর্মঠ।
 কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না – অনিবার্য।
 চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত – চাক্ষুষ।
 জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্ত।
 তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শী।
 দিনে যে একবার আহার করে – একাহারী।
 নষ্ট হওয়াই স্বত্বাব যার – নশ্বর।
 নদী মেখলা যে দেশের – নদীমেখলা।
 নোকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে – নাবিক।
 পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক।
 ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি।
 বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী।
 বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন।
 মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমুর্শু।
 যা দমন করা যায় না – অদম্য।
 যা দমন করা কষ্টকর – দুর্দমনীয়।
 যা নিবারণ করা কষ্টকর – দুর্নিবার।
 যা পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
 যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি।

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে – সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব।
 যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই – অকুতোভয়।
 যার আকার কৃৎসিত – কদাকার।
 যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে – অযত্নলব্ধ।
 যা বার বার দুলছে – দোদুল্যমান।
 যা দীপ্তি পাচ্ছে – দেদীপ্যমান।
 যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন – অনন্যসাধারণ।
 যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন – অদ্যুপূর্ব।
 যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়।
 যা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্গভ।
 যা অধ্যয়ন করা হয়েছে – অধীত।
 যা জলে চরে – জলচর।
 যা স্থলে চরে – স্থলচর।
 যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর।
 যা বলা হয়নি – অনুস্ত।
 যা কখনো নষ্ট হয় না – অবিনশ্বর।
 যা মর্ম স্পর্শ করে – মর্মস্পর্শী।
 যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য।
 যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
 যার বৎশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না – অজ্ঞাতকুলশীল।
 যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না – বর্ণচোরা।
 যা চিন্তা করা যায় না – অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য।
 যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু-বন্ধুর।
 যা সম্ভল করতে বহু ব্যয় হয়-ব্যয়বহুল।
 যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
 যার বিশেষ খ্যাতি আছে – বিখ্যাত।
 যা আঘাত পায়নি – অনাহত।
 যা উদ্দিত হচ্ছে – উদীয়মান।
 যার অন্য উপায় নেই – অনন্যোপায়।
 যার কোনো উপায় নেই – নিরূপায়।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে – বর্ধিষ্ঠু।
 যা পূর্বে শোনা যায়নি – অশুতপূর্ব।
 যে শুনেই মনে রাখতে পারে – শুতিধর।
 যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
 যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় – স্বয়ংবরা।
 যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফল ধরে না – বনস্পতি।
 যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে – হাতুড়ে।
 যে নারীর সন্তান বাঁচে না – মৃতবৎসা।
 যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা।
 যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরগাছা।
 যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার।
 যে মেয়ের বিয়ে হয়নি – অনৃতা।
 যে ক্রমাগত রোদন করছে – রোঁয়ুদ্যমান।
 যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না – অপরিগামদশী।
 যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃত্যকারী।
 যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসংবাদ) নেই – অবিসংবাদিত।
 যে বন হিন্দু জন্মতে পরিপূর্ণ – শ্঵াপদসংকুল।
 যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্নী।
 যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় – সর্বহস্তা।
 যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ।
 যে নারীর কোনো সন্তান হয় না – বন্ধ্যা।
 যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে – কাকবন্ধ্যা।
 যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর – সুদর্শন।
 যে রব শুনে এসেছে – রবাহুত।
 লাভ করার ইচ্ছা – লিঙ্গা।
 শুভ ক্ষণে জন্ম যার – ক্ষণজন্ম।
 সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা – প্রত্যুদ্গমন।
 সকলের জন্য প্রযোজ্য – সর্বজনীন।
 হনন করার ইচ্ছা – জিঘাঃসা।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উভয়ের সর্বোন্তমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(১) ভাষার মূল উপকরণ কী ?

ক. ধ্বনি

গ. বাক্য

খ. শব্দ

ঘ. বর্ণ

(২) বাক্যে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে ?

ক. আসন্তি

গ. আকাঙ্ক্ষা

খ. যোগ্যতা

ঘ. আসন্তি

(৩) ‘শবপোড়া’ শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায় ?

ক. গুরুচঙ্গলী

গ. আকাঙ্ক্ষার ভুল প্রয়োগ

খ. উপমা প্রয়োগে ভুল

ঘ. দুর্বোধ্যতা

(৪) কোনটি বাগধারার শব্দ পরিবর্তনজনিত ভুলের উদাহরণ ?

ক. ঘোড়ার ডিম

গ. গৌরীসেনের টাকা

খ. গোড়ায় গলদ

ঘ. ঘোটকের ডিম্ব

(৫) কোন বাক্যাংশটি গুরুচঙ্গলী দোষযুক্ত ?

ক. ঘোড়ার গাড়ি

গ. শবদাহ

খ. ঘোটকের গাড়ি

ঘ. মড়াপোড়া

(৬) উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

ক. উপকার-স্বীকারী

গ. কৃতম্ব

খ. অকৃতজ্ঞ

ঘ. কৃতজ্ঞ

(৭) নষ্ট হওয়া স্বত্বাব যার — এক কথায় কী হবে ?

ক. অবিনশ্বর

গ. নষ্টস্বত্বাব

খ. নশ্বর

ঘ. বিনষ্ট

(৮) যা পূর্বে দেখা যায়নি — এক কথায় কী হবে ?

ক. অদ্যুষ্ট

গ. অপূর্ব

খ. দ্রষ্টপূর্ব

ঘ. অদ্রষ্টপূর্ব

২। বাক্য বলতে কী বোঝ? কোনো একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেখ।

৩। ‘শব্দের যোগ্যতা বিচার রীতিমত কঠিন কাজ, কেননা শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত থাকে।’ – এ উক্তিটির সমর্থনে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

৪। কী কী উপায়ে বিধেয়ের সম্প্রসারণ হতে পারে? স্বরচিত বাক্যে উপায়সমূহের উদাহরণ দাও।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও :

(ক) মিশ্রবাক্য, (খ) আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য, (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য

৬। যৌগিক বাক্য ও সরল বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোকে নির্দেশিত বস্থনীযুক্ত বাক্যে রূপান্তর কর

(ক) সত্য কথা বল নি, সুতরাং বিপদে পড়েছ। (সরল বাক্য)

(খ) অপরাধ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। (মিশ্র বাক্য)

(গ) যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। (যৌগিক বাক্য)

(ঘ) যখন দুর্দিন আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)

(ঙ) যে ভিক্ষা করতে এসেছে, তাকে ভিক্ষা দাও। (সরল বাক্য)

(চ) তাকে দেখা মাত্রই আমরা চলে গেলাম। (মিশ্র বাক্য)

৮। নিম্নলিখিত বাক্য তিনটি বিশ্লেষণ কর :

(ক) ধাঁরা সত্যিকার কর্মী, তাঁরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হন।

(খ) মানব-সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।

(গ) পথিক বিবেচনা করলেন যে, পথচারী মহিলাটি ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বিপদে পড়েছেন।

৯। বাক্য সংক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাক্যাংশের সংক্ষেপণ হতে পারে? উদাহরণসহ বিশদ আলোচনা কর।

১০। ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আকাশে চরে বেড়ায় যে : আকাশচারী/চিল/খেচর।

(খ) যে উপকারীর অপকার করে : অপকারক/কৃতন্ত/অকৃতজ্ঞ।

(গ) যা দমন করা যায় না : দুর্দম/দুর্দমনীয়/ অদম্য।

(ঘ) যা দীপ্তি পাচ্ছে : সন্দীপন/দীপ্তিমান/দেদীপ্যমান।

- (ঙ) যা বলা হয়নি : অকথিত/অনুস্তুত/অবাচ্য।
 (চ) যার কোনো উপায় নেই : নাচার/অনুপায়/নিরূপায়।
 (ছ) হনন করার ইচ্ছা : হননেচ্ছা/জিঘাঃসা/জিজ্ঞাসা।

১১। এক শব্দে পরিণত কর এবং এই শব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

- (ক) সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত।
 (খ) লাভ করার ইচ্ছা।
 (গ) যে ক্রমাগত কাঁদছে।
 (ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
 (ঙ) যা বলার যোগ্য নয়।
 (চ) যার স্বাভাবিক বর্ণ ধরা যায় না।
 (ছ) যার আকার কুৎসিত।
 (জ) যে গাছ অন্য গাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচে।
 (ঝ) যা আঘাত পায়নি।
 (ঝঝ) যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগ্ধারা

বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে, যাদের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে ব্যবহারিক অর্থের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। বহুভাবে এ ধরনের পার্থক্য দৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন—

- (১) শিষ্টরীতি বা রাতিসিদ্ধ প্রয়োগঘটিত : ছাত্রটির মাথা ভালো। এখানে ‘মাথা’ বলতে ‘দেহের অঙ্গবিশেষ’ বোঝায় না, বোঝায় ‘মেধা’।
- (২) শব্দের অর্থ সংকোচে : ইনি আমার বৈবাহিক। এখানে ‘বৈবাহিক’ শব্দে ‘বিবাহ সূত্রে সম্পর্কিত’ অর্থ না বুঝিয়ে ‘ছেলে বা মেয়ের শ্বশুর সম্পর্কিত’ ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।
- (৩) শব্দের অর্ধাঙ্গের প্রাপ্তিতে : মেয়ের শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হয়েছে। এখানে ‘তত্ত্ব’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ‘সহবাদ’ না বুঝিয়ে ‘উপটোকন’ অর্থ বোঝাচ্ছে। একে নতুন অর্থের আবির্ভাব বলা চলে।
- (৪) শব্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তিতে : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এখানে ‘পরমহংস’ শব্দের সঙ্গে হাসের কোনো সম্পর্ক নেই, এর অর্থ ‘সন্ন্যাসী’।
- (৫) শব্দের অপকর্ষ (বা অধোগতি) বোঝাতে : জ্যাঠামি করো না। এখানে ‘জ্যাঠামি’ শব্দের সঙ্গে ‘জ্যাঠা’র (পিতার বড় ভাইয়ের) কোনো সম্পর্ক নেই; শব্দটি ‘ধূর্ঘটা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শব্দের ব্যবহার দুই প্রকার : (১) বাচ্যার্থ ও (২) লক্ষ্যার্থ।

১. বাচ্যার্থ : যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আভিধানিক অর্থই তাদের বাচ্যার্থ।

২. লক্ষ্যার্থ : যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই অন্য অর্থগুলো তাদের লক্ষ্যার্থ।

বাগ্ধারা বা বাক্যরীতি

কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সে সকল শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাগ্ধারা বা বাক্যরীতি বলা হয়।

‘মুখ’ শব্দযোগে বাগ্ধারার উদাহরণ

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| (ক) এ ছেলে বৎশের মুখ রক্ষা করবে | — | (সম্মান বাঁচানো) |
| (খ) শুধু শুধু ছেলেটাকে মুখ করছ কেন? | — | (গালমন্দ করা) |
| (গ) এবার গিন্নির মুখ ছুটেছে। | — | (গালিগালাজের আরম্ভ) |
| (ঘ) টক খেয়ে মুখ ধরে আসছে। | — | (মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া) |
| (ঙ) খোদা মুখ তুলে চাইলে অবশ্যই ব্যবসায়ে লাভ হবে। | — | (অনুগ্রহ লাভ করা) |

বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

- (ক) হাত আসা — কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
- (খ) হাত গুটান — হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)
- (গ) হাত করা — সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়ত্তে আনা)
- (ঘ) হাত ছাড়া — টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচূর্ণ)
- (ঙ) হাত থাকা — এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)

দ্রষ্টব্য : বাগ্ধারা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগও বলে।

‘হাত’ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

- (ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : এ টাকা কঠিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।
- (খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন।
- (গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারস্ত) : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে।
- (ঘ) হাতে কলমে (স্বহস্তে, কার্যকর ভাবে) : হাতে-কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

২. মাথা

- | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|------------------|---|------------|
| (ক) মাথা ধরা | — | রোগ বিশেষ | (খ) গাঁয়ের মাথা | — | মোড়ল। |
| (গ) মাথা ব্যথা | — | আগ্রহ | (ঘ) মাথা খাওয়া | — | শপথ করা। |
| (ঙ) মাথা দেওয়া | — | দায়িত্ব গ্রহণ | (চ) মাথা ঘামানো | — | ভাবনা করা। |
| (ছ) মাথাপিছু | — | জনপ্রতি | | | |

মাথা শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

বাক্য গঠন

- | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| রাস্তার মাথায় | — | মিলন স্থলে। | রাস্তার মাথায় তার সঙ্গে দেখা। |
| মাথা গরম করা | — | রাগান্বিত হওয়া। | মাথা গরম করে আর কী হবে? |
| রাগের মাথায় | — | হঠাতে ক্রোধবশত। | রাগের মাথায় কথাটা বলেছি। |
| মাথা হেঁট করা | — | লজ্জায় মাথা নিচু করা। | মাথা হেঁট হবে কেন? |
| মাথা উঁচু করে চলা | — | গর্বভরে চলা। | মাথা উঁচু করেই চলতে চাই। |

বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

১. কাঁচা

কাঁচা আম	—	অপরিপন্থ আম।	কাঁচা খাতা	—	খসড়া।
কাঁচা কথা	—	গুরুত্বহীন কথা।	কাঁচা ইট	—	অদগ্ধ ইট।
কাঁচা ঘূম	—	অল্প ক্ষণের ঘূম।	কাঁচা চুল	—	কালো চুল।
কাঁচা বয়স	—	অপরিণত বয়স।	কাঁচা সোনা	—	নিখাদ সৰ্ব।

বাক্য গঠন : কাঁচা সোনার মতো তার গায়ের রং।

কাঁচা (আনাড়ি) লোকই কাঁচা (অনিপুণভাবে) কাজ করে থাকে।

বাক্যে ‘পাকা’ বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

পাকা কথা (শেষ সিদ্ধান্তসূচক) চাই।

পাকা বন্দোবস্ত (স্থায়ী) করে এসেছি।

এ হচ্ছে পাকা রাঁধুনির (দক্ষ) রান্না।

ইচড়ে পাকা (অকালে পরিপন্থ) ছেলেদের কথা অসহ্য।

একেবারে পাকা হাতের (দক্ষ লেখকের) লেখা।

আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি (হক নষ্ট করা) যে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

‘করা’ ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

মনে করলাম এবার তীর্থে যাব। (সংকল্প করা)

সে ফুটবল খেলায় নাম করেছে। (যশস্বী হওয়া)

টাকা করে নাম কিনতে চাও? (খ্যাতি লাভের চেষ্টা করা)

চাকরি পাওয়ার কোনো জো করে উঠতে পারিনি। (সুযোগ পাওয়া)

‘ধরা’ ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

কান ধরা	—	কর্ণ মর্দন করা।	মনে ধরা	—	পছন্দ হওয়া।
দোষ ধরা	—	অপরাধ গণনা করা।	আগুন ধরা	—	আগুন লাগা।
পথ ধরা	—	উপায় দেখা।	ম্যাও ধরা	—	দায়িত্ব নেওয়া।
হাতে-পায়ে ধরা	—	অনুরোধ করা।	গৌ ধরা	—	একঙ্গুয়েমি করা।
গলা ধরা	—	কষ্ট বৃদ্ধ হওয়া। (কথা বৰ্ধ হয়ে যাওয়া)			

দ্রষ্টব্য : শব্দাত্মক ও পদাত্মক বাগধারার অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন—

{ গা সওয়া	— অভ্যস্ত হওয়া	{ গা লাগা	— মনোযোগ দেওয়া।
গায়ে সওয়া	— দেহে সহ্য হওয়া।	গায়ে লাগা	— অনুভূত হওয়া।
{ পায়ে পড়া	— ক্ষমা প্রার্থনা করা।	{ হাত আসা	— অভ্যস্থ হওয়া।
পায় পড়া	— খোশামুদ্দে।	হাতে আসা	— আয়ন্ত হওয়া।
{ রোগ ধরা	— রোগ নির্ণয়।		
রোগে ধরা	— রোগাক্রান্ত হওয়া।		

বাগধারার ব্যবহার

অকাল কুম্ভান্ত (অপদার্থ, অকেজে)	— অকাল কুম্ভান্ত ছেলেটার ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিও না।
অঙ্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)	— অনেক রোগভোগের পর শয়তানটা শেষ পর্যন্ত অঙ্কা পেয়েছে।
অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান)	— ডাকাতি মামলার আসামি হওয়ায় করিম গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি)	— সরল মনে হলেও লোকটা আসলে অগাধ জলের মাছ।
অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা)	— শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
অম্বের ষষ্ঠি অম্বের নড়ি } (একমাত্র অবলম্বন)	— বিধিবার একমাত্র সম্ভান তার অম্বের ষষ্ঠি/অম্বের নড়ি।
অগ্নিশর্মা (নিরতিশয় ক্রুদ্ধ)	— তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন।
অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা)	— জাতিকে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, তব পেলে চলবে না।
অন্ধকারে চিল মারা (আম্দাজে কাজ করা)	— অন্ধকারে চিল মেরে সব কাজ ঠিকভাবে করা যায় না।
অকূল পাথার (ভীষণ বিপদ)	— অকূল পাথারে আল্লাহই একমাত্র সহায়।
অনুরোধে টেকি গেলা (অনুরোধে দুরুহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্ভিতি জ্ঞাপন) — অনুরোধে টেকি গেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি এ কাজ করতে পারব না।	
অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা)	— অদৃষ্টের পরিহাসে রাজাও ভিখারি হয়।
অল্লবিদ্যা তয়ৎকরী (সামান্য বিদ্যার অহংকার)	— কিছুই জানে না, আবার দেমাক কত — অল্লবিদ্যা তয়ৎকরী আর কি।
অনধিকার চৰ্চা (সীমার বাইরে পদক্ষেপ)	— কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি অনধিকার চৰ্চা করি না।
অরণ্যে রোদন (নিষ্কল আবেদন)	— কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।
অহিনকুল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা)	— দুভাইয়ের মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

- অল্পকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া) — এ বিপদে আমি যে সব অল্পকার দেখছি।
- অমাবস্যার চাঁদ (দূর্লভ বস্তু) — তোমার দেখা পাওয়াই ভার, অমাবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছ।
- আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) — মূর্খরাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।
- আকাশ পাতাল (প্রচুর ব্যবধান) — ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।
- আকেল সেলামি (নির্বাচিতার দণ্ড) — বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে চড়ে আকেল সেলামি দিতে হলো।
- আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাতে বড়লোক) — যুন্দের বাজারে দেদার টাকা পয়সা কামাই করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
- আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দূর্লভ বস্তু প্রাপ্তি) — হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাপ-মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।
- আদায় কাঁচকলায় (শত্রুতা) — তার সঙ্গে আমার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, সে আমার দুশ্মন।
- আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) — কাজটি শেষ করার জন্য সে আদা জল খেয়ে লেগেছে।
- আকেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত) — ইচ্ছে পাকা ছেলেটার কথা শুনে আমার আকেল গুড়ুম।
- আমড়া কাঠের টেঁকি (অপদার্থ) — ও হচ্ছে ধনীর দুলাল, আমড়া কাঠের টেঁকি, ওকে দিয়ে কিছুই হবে না।
- আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) — ব্যাংক ফেল করেছে শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।
- আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, দিখা করা) — আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথায় দোষ স্বীকার কর।
- আটকপালে (হতভাগ্য) — ছেলেটা এতিম, আটকপালে।
- আঠার মাসে বছর (দীর্ঘস্মৃতি) — তোমার তো আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।
- আলালের ঘরের দুলাল (যতি আলারে বড় লোকের নষ্ট পুত্র) — বড়লোকের ঘরে দু-একজন আলালের ঘরের দুলাল মিলবেই।
- আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) — চাঁচুকাররা ধনী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।
- আষাঢ়ে গঞ্জ (আজগুবি কেছে) — চাঁদে যাওয়ার কথাটা একসময় ছিল আষাঢ়ে গঞ্জ।
- ইন্দুর কপালে (নিতান্ত মন্দ ভাগ্য) — আমার মতো ইন্দুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।
- ইচ্ছে পাকা (অকালপক্ষ) — অতবড় মানুষটার সাথে তর্ক করছে, কী ইচ্ছে পাকা হলে বাবা।
- ইতর বিশেষ (পার্থক্য) — সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতর বিশেষ নেই।
- উভয় মধ্যম (প্রহার, পিটুনি) — গৃহস্থ চোরটাকে উভয় মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।
- উড়নচঞ্চী (অমিতব্যয়ী) — এমন উড়নচঞ্চী হলে দুদিনে টাকাকড়ি সব শেষ হবে।
- উভয় সংকট — ‘শাখের করাত’ দেখ।

- উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান)** — তাকে সদৃশদেশ দান, উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই নিষ্কল ।
- উড়োচিঠি (বেনামি পত্র)** — ডাকাতরা জমিদার বাড়িতে উড়োচিঠি দিয়ে ডাকাতি করেছিল ।
- উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অধিকার)** — লোকটার মাতবরি দেখলে গা জুলে যায় । ও এখানকার লোক নয়, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ।
- একঙ্কুরে মাথা মুড়ানো (একই স্বভাবের)** — সকলেই একঙ্কুরে মাথা মুড়িয়েছে দেখছি, পরীক্ষায় সবাই ফেল করেছে ।
- একচোখা (পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট)** — একচোখা লোকের কাছে সুবিচার পাওয়া যায় না ।
- এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)** — আমাকে ফাঁকি দিলে, মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না ।
- এলোপাতাড়ি (বিশৃঙ্খলা)** — এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে শত্রুদলের ক্ষতি করতে পারবে না ।
- এসপার ওসপার (মীমাংসা)** — চুপ করে থেকে লাভ কী, এসপার ওসপার একটা করে ফেল ।
- একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়)** — এখন তার একাদশে বৃহস্পতি, ধূলোমুঠোও সোনামুঠো হচ্ছে ।
- এলাহি কাউ (বিরাট আয়োজন)** — বড় বাড়িতে বিয়ে, সেতো এক এলাহি কাউ হবে ।
- কলুর বলদ (একটালা খাটুনি)** — কলুর বলদের মতো সংসারের চাকায় ঘুরে মরাই ।
- কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা)** — কারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি, এটা একটা কথার কথা ।
- কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ)** — লটারির টিকেট কিনে সে তার কপাল ফেরাতে চায় ।
- কত ধানে কত চাল (হিসাব করে চলা)** — নিজেকে তো আর উপর্যুক্ত করতে হয় না, কত ধানে কত চাল হয় বুঝবে কেমন করে ।
- কড়ায় গঢ়ায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি)** — সে কড়ায় গঢ়ায় তার পাঞ্জনা বুঝে নিল ।
- কান খাড়া করা (মনোযোগী হওয়া)** — আমি কী বলি তা শোনার জন্য সে কান খাড়া করে রইল ।
- কাঁচা পয়সা (নগদ উপর্যুক্ত)** — কাঁচা পয়সা পাও কি না, তাই খরচ করতে বাধে না ।
- কাঁঠালের আমসন্ত (অসম্ভব বস্তু)** — ঐ হাড়কিপ্টে করবে দান, কাঁঠালের আমসন্ত আর কি ।
- কূপমন্ডুক (ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন)** — তুমি তো কূপমন্ডুক, ‘ঘরে হৈতে আঞ্জিনা বিদেশ’ ।
- কেতাদুরস্ত (পরিপাটি)** — কথাবার্তায়, পোশাকপরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত হলেও সে অন্তঃসারশূন্য ।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার) — রাজা কাঠের পুতুলের মতো সিংহাসনে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীই দেশ শাসন করতেন।

কথায় চিঠ্ঠে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) — কাজটি করাতে হলে নগদ কিছু ঢালো, শুধু কথায় চিঠ্ঠে ভেজে না।

কান পাতলা (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ) — কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা কঠিন।

কাছা টিলা (অসাবধান) — কাছা টিলা লোককে কোনো বড় দায়িত্ব দিতে নেই।

কুলকাঠের আগুন (তীব্র ঝালা) — তোমার কথার খোঁচায় আমার সারা দেহে কুলকাঠের আগুন ঝলছে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি) — ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

কেউকেটা (সামান্য) — ও একেবারে কেউকেটা লোক নয়, ওর সঙ্গে লাগতে যেও না।

কেঁচে গন্ধুস (পুনরায় আরম্ভ) — সবটাই ভুল হয়েছে, আবার কেঁচে গন্ধুস করতে হবে দেখছি।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) — লোকটা এত অত্যাচারেও মরেনি, কৈ মাছের প্রাণ দেখছি।

খয়ের খা (চাটুকার) — তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খা, তিনি যা বলেন তুমি তাই বল।

খন্দ প্রলয় (তুমুল কান্দ, ভীষণ ব্যাপার) — সামান্য ঘটনা থেকে এমন খন্দ প্রলয় হবে ভাবিন।

গড়লিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) — গড়লিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, আমি তাদের দলে নেই।

গদাই লস্করি চাল (অতি ধীর গতি, আলসেমি) — এমন গদাই লস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে।

গণেশ উল্টানো (উঠে যাওয়া, ফেল মারা) — কর্মচারীদের চুরির ফলে দোকানটা গণেশ উল্টিয়েছে।

গলগ্রহ (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা) — কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী কষ্ট, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

গৌয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) — সে যেমন জেদি তেমনি রাগী, তার মতো গৌয়ার গোবিন্দকে নিয়ে পথ চলা যায় না।

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া) — কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

গোবর গণেশ (মূর্খ) — না জানে লেখাপড়া, না আছে বুদ্ধি — ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ।

গাছে তুলে মই কাড়া (আশা দিয়ে আশ্বাস ভজা করা) — আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছ, একেই বলে গাছে তুলে মই কাড়া।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) — গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে সহসার চলবে কেমন করে?

গৌফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) — গৌফ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

- গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল)** — অঙ্ক মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ।
- গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)** — আশা করেছিলাম মামার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।
- ঘর ভাঙানো (সংসার বিনষ্ট করা)** — তোমার মতো ঘর ভাঙানো বৌ আর দেখিনি।
- ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ)** — টাকার লোভে ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না।
- ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ)** — মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাড়ি কিনতে চাও, একেই বলে গরিবের ঘোড়ারোগ।
- যোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা)** — অফিসের বড় সাহেবকে না জানিয়ে ছেট সাহেবকে বলা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।
- চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য)** — ধনেজনে চৌধুরী সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।
- চিনির বলদ (ভারবাহী তবে ফল লাভের অংশীদার নয়)** — সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে মরছি, কিছুই পাই না।
- চোখের বালি (চক্ষুশূল)** — বখাটে ছেলেটা সকলের চোখের বালি।
- চোখের পর্দা (লজ্জা)** — তোমার দেখছি চোখের পর্দা নেই; কেমন করে এ কাজ করলে?
- ছকড়া নকড়া (সম্মত দর)** — নিলামের মাল, তাই ছকড়া নকড়ায় বিক্রি হয়ে গেল।
- ছাপোষা (অত্যন্ত গরিব)** — আমার মতো ছাপোষা লোকের কোনো শখ থাকতে নেই।
- ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা)** — পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করল না?
- ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু)** — রত্নহার ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।
- জগাখিচুড়ি পাকানো (গোলমাল বাধানো)** — ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে সে সরে পড়ল।
- জিলাপির পঁয়াচ (কুটিলতা)** — ভালোমানুষ মনে হলেও তার ভেতরে রয়েছে জিলাপির পঁয়াচ।
- বোপ বুবো কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা)** — বোপ বুবো কোপ মারতে পেরেছে বলেই সে কৃতকার্য হয়েছে।
- টনক নড়া (চৈতন্যেদয় হওয়া/বুবো ওঠা)** — ব্যবসায় ক্ষতি হতেই তার টনক নড়ল।
- ঠাট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা)** — অভাবে পড়লেও তিনি ঠাট বজায় রেখে চলেছেন।
- ঠেঁটকাটা (বেহায়া)** — তোমার মতো ঠেঁট কাটা ছেলে আর দেখিনি, মুখের ওপর এ কথা বললে।
- ডুমুরের ফুল** — ‘অমাবস্যার চাঁদ’ দেখ।

- ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন রাখার চেষ্টা) — ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে লাভ কী, ব্যাপারটা খুলে বল।
- ঢাকের কাঠি (মোসাহেব)
- ‘খয়ের খা’ দেখ।
- তালকানা (বেতাল হওয়া)
- চোখে চশমা, আর চশমা ঝুঁজে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তালকানা লোক।
- তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী বস্তু)
- ঠুনকো বস্তুত্ব স্মার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।
- তামার বিষ (অর্পের কু প্রভাব)
- হঠাত বড় লোক কি না, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।
- থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া)
- তোমার কাউ দেখে আমি তো থ বনে গেলাম।
- দা-কুমড়া
- ‘আইনকুল’ দ্রষ্টব্য।
- দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্রক্ষ)
- সাহেবের সাথে তোমার যখন এত দহরম মহরম, তখন কাজটা করিয়ে দাও ভাই।
- দুমুখো সাপ (দুজনকে দুরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী) — লোকটা একটা দুমুখো সাপ; আমাদের দুজনকে দুরকম কথা বলে দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।
- দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু)
- সুদিনে যে দুধের মাছি, দুর্দিনে তার সাক্ষাৎ মেলে না।
- ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সকলকে তুচ্ছ ভাবা)
- বড়লোক হয়েছ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না।
- ধরি মাছ না ছুই পানি (কৌশলে কার্যোদ্ধার)
- এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা হবে ধরি মাছ না ছুই পানি।
- ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ)
- ছেলেটি একেবারে ননীর পুতুল, একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠে।
- নয়ছয় (অপচয়)
- সে বাড়ি বিক্রির টাকাগুলো নয়ছয় করে ফেলল।
- নেই আঁকড়া (একগুরো)
- এমন নেই আঁকড়া ছেলে আর তো দেখিনি বাবা যা বলবে তাই!
- পটল তোলা (অঙ্কা পাওয়া)
- শয়তানটা পটল তুলেছে, এবার গাঁয়ের লোকের হাড় জুড়াবে।
- পালের গোদা (দলপতি)
- পুলিশ পালের গোদাকে ধরতে পারেনি, সাধারণ মানুষের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে।
- পুকুরচুরি (বড় রকমের চুরি)
- কিছু কর্মচারী পুকুরচুরি করে প্রতিষ্ঠানে লালবাতি ছালিয়েছে।
- ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি)
- সবথামে ফপর দালালি চলে না, জায়গা বুঝে কাজ করতে হয়।
- ফোড়ন দেওয়া (টিপ্পনি কাটা)
- কথায় কথায় ফোড়ন দিলে কাজ করা দায় হয়ে উঠবে।
- বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী (ভদ্র সাধু)
- মুখে ধর্মের কথা বললেও লোকটা আসলে বক ধার্মিক।
- বর্ণচোরা (কপট ব্যক্তি)
- লোকটা বর্ণচোরা, তার আসল রূপ ধরা যায় না।
- বালির বাঁধ (অস্থায়ী বস্তু)
- ‘বড়ুর পিরিতি যেন বালির বাঁধ।’
- বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘৃষ গ্রহণ)
- এ অফিসের কিছু কর্মচারী বাঁ হাতের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

- বাধের দুধ/চোখ (দুঃসাধ্য বস্তু)
- বিসমিল্লায় গলদ
- বুদ্ধির টেকি (নিরেট মূর্খ)
- ব্যাণ্ডের আধুলি (সামান্য সম্পদ)
- ব্যাণ্ডের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা)
- ভরাডুবি (সর্বনাশ)
- ভূতের বেগার (অযথা শ্রম)
- ভিজে বিড়াল (কপটাচারী)
- ভূষণির কাক (দীর্ঘজীবী)
- মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ)
- মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন)
- মন না মতি (অস্থির মানব মন)
- মাছের মায়ের পুত্রশোক (কপট বেদনাবোধ)
- মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)
- যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি)
- রাঘব বোয়াল (সর্বগামী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি)
- রাবণের চিতা (চির অশান্তি)
- রাশতারি (গম্ভীর প্রকৃতির)
- রুই-কাতলা (পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)
- লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)
- শাঁখের করাত (উভয় সংকট)
- টাকায় বাধের দুধ মেলে।
 - ‘গোড়ায় গলদ’ দ্রষ্টব্য।
 - ‘ইঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির টেকি।’
 - এই সামান্য কটা টাকা ব্যাণ্ডের আধুলি আর কি।
 - জেল খাটা আসামিকে দেখাচ্ছ জেলের তয়— ব্যাণ্ডের আবার সর্দি!
 - আমি কারো ভরাডুবি করিনি যে সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছে।
 - জীবনভর ভূতের বেগার খেটে গেলাম, লাভ কিছুই হলো না।
 - সমাজে ভিজে বেড়ালদের চেনা সহজ নয়।
 - স্ত্রী, পুত্র, কন্যা— সবার মৃত্যুর পরও বৃন্দ ভূষণির কাকের মতো বেঁচে আছে।
 - এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে?
 - যেমন বর, তেমনি কনে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।
 - মানুষের মন তো বদলেই থাকে; কথায় বলে— ‘মন না মতি’।
 - নিজের পুত্রের মৃত্যুতে একফোটা চোখের পানি পড়ল না— অথচ অন্যের জন্য কাঁদছে, এ যে মাছের মায়ের পুত্রশোক।
 - শুনতে মধুর হলেও তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো অতরকে বিন্দু করে।
 - যক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, এক পয়সাও দান করে না।
 - সমাজপত্রিকা রাঘব বোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।
 - ‘রাবণের চিতাসম জ্বলিছে হৃদয় মম।’
 - আমাদের বড় সাহেব খুব রাশতারি লোক, তাঁর সাথে বুঝেসুঝে কথা বলো।
 - দেশের সুযোগ সুবিধা রুই-কাতলারাই বেশি ভোগ করে।
 - এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দিকশূন্য?
 - সত্যকথা বললে আবার ক্ষতি, আবার মিথ্যাকথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাতের অবস্থা।

- শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) — আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা—একেই বলে শাপে বর।
- সোনায় সোহাগা — ‘মণি কাথ্বল যোগ’ দ্রষ্টব্য।
- সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক) — তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।
- হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা) — আমাকে হাঁটিও না বলছি, তা হলে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।
- হাতটান (চুরির অভ্যাস) — দামি জিনিসপত্র সাবধানে রেখ, ছেলেটার হাতটান অভ্যাস আছে।
- হাড় হাতাতে (হতভাগ্য) — সব হারিয়ে ছেলেটি একেবারে হাড় হাতাতে এর কিছু হবে না।
- হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা) — ব্যবসায় অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু হালে পানি পেলাম না।

সমার্থক শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক বা একার্থক শব্দ বলে। রচনার মাধ্য সৃষ্টির জন্য অনেক সময় একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়। কবিতায় এর প্রয়োগ বেশি। এখানে কতগুলো সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

অন্ধকার	— আঁধার, তমসা, তিমির।	পৃথিবী	— অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী।
আকাশ	— অন্ধর, গগন, নতৎ, ব্যোম।	পর্বত	— অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল।
আগুন	— অগ্নি, অনল, পাবক, বহি, হৃতাশন।	পিতা	— আবাবা, জনক, বাবা।
ঈশ্বর	— আল্লাহ, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, তগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা।	পুত্র	— ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত।
কান	— কর্ণ, শ্রবণ।	মাতা	— গর্ভধারিণী, প্রসূতি, মা, জননী।
চূল	— অলক, কুন্তল, কেশ, চিকুর।	কোকিল	— পরাভৃত, পিক।
চোখ	— অঙ্গি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন।	গরু	— গো, গাভী, ধেনু।
জল	— অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল।	চাঁদ	— চন্দ্ৰ, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাম্বু, হিমাম্বু।
তীর	— কূল, তট, সৈকত।	রাজা	— নৃপতি, নরপতি, ভূপতি।
দিন	— দিবস, দিবা।	সূর্য	— আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর,
দেবতা	— অমর, দেব, সুর।		তানু, মার্ত্তন, রবি, সবিতা।
দেহ	— গাত্র, গা, তনু, শরীর।	স্বর্গ	— দেবলোক, দুলোক, বেহেশত।
ধন	— অর্থ, বিস্ত, বিভব, সম্পদ।		

নদী	- তটিনী, স্নোতস্বতী, স্নোতস্বিনী।	সাপ - অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গা,
নারী	- অবলা, কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী।	সর্প।
মৃত্যু	- ইলেক্ট্রিকাল, ইহলীলা-সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্মাতবাসী হওয়া। দেহত্যাগ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তরগমন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, স্বর্গলাভ।	সম্মুদ্র - অর্ণব, জলধি, জলনধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু।
		হাত - কর, বাহু, ভুজ, হস্ত।

বাকে প্রয়োগ

- * ‘কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।’
- * ‘গগনে উদিল রবি লোহিত বরণ।’
- * দিবসে আলসে নিদ্রা অতি দূর্ঘীয়।
- * অবলা সবলা আজ নহে তো দুর্বলা।
- * প্রচন্ড মার্জন তাপে গলিছে তুষারপিণ্ড।

বিভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ থাকলে তাকে বিভিন্নার্থক শব্দ বলে। উদাহরণ-

- | | | |
|----------|--------------------------|---|
| ১। অঙ্ক- | (১) সংখ্যা | - টাকার অঙ্ক কত হবে? |
| | (২) আঁক | - অঙ্কটা কষ। |
| | (৩) চিহ্ন | - পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) অনসুরণ কর। |
| | (৪) কোল | - শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন। |
| | (৫) নাটকের প্রধান পরিচেদ | - এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ। |
| ২। অচল- | (১) গতিহীন | - শরীর অচল হয়ে পড়েছে। |
| | (২) একনিষ্ঠ | - ঈশ্বরে অচল ভক্তি হোক। |
| | (৩) মেকি, অব্যবহার্য | - এ অচল টাকা কে নেবে? |
| | (৪) অপ্রচলিত | - হাজার টাকার এই নেটটি অচল। |
| | (৫) নির্বাহ করা কঠিন | - অর্ধের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে। |
| | (৬) পর্বত | - ‘উচল বলিয়া অচলে বাড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।’ |

- ৩। অন্তর—** (১) মন
 (২) অন্য
 (৩) ব্যবধান, পার্থক্য
 (৪) আত্মায়
- ‘অন্তর মম বিকশিত কর।’
 — তিনি দেশান্তরে গিয়েছেন।
 — এখান থেকে একঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে।
 — ‘অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।’
- ৪। কূট—** (১) কৃটিল
 (২) জটিল
 (৩) কপট, জাল
 (৪) পর্বতশৃঙ্গা
- তার কূট বৃদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন?
 — এটা কূট প্রশ্ন, উন্নত দেওয়া কঠিন।
 — কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সে এসে ধরা পড়েছে।
 — পর্বতকূটে আরোহণ করা দুর্ভুত।
- ৫। গুণ—** (১) ধর্ম
 (২) ক্রিয়া
 (৩) উৎকর্ষ
 (৪) দড়ি
- দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
 — ওষুধে গুণ করেছে।
 — ভূমি তো নিজের গুণকীর্তন করছ।
 — মাঝিরা নৌকার গুণ টেনে এসেছে।
- ৬। ধর্ম—** (১) সৎকাজ, পুণ্যকাজ
 (২) সুনীতি
 (৩) সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনাপন্থতি ইত্যাদি – প্রত্যেক ধর্মই মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে।
 (৪) স্বভাব
- অহিংসা পরম ধর্ম।
 — এটা ধর্মসংগত কাজ।
 — মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।
- ৭। পক্ষ** (১) দল
 (২) মাসার্ধ
 (৩) চাঁদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি কাল
 (৪) পাথির ডানা
 (৫) বিয়ে সংখ্যা
- ভূমি কোন পক্ষে?
 — দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস।
 — এখন শুল্কপক্ষ।
 — যাদের পক্ষ আছে তাদের পাথি বলে।
 — ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

শব্দের পূর্বে সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, ন, না, নি, নির প্রায়ই না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দের বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে। তবে গঠনগত দিক থেকে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। উদাহরণ :

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক
কাজ	অকাজ	সপ্তরয়	ব্যয়
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত, অনুন্নত
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতন্ত	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
কেজো	অকেজো	যশ	অপযশ
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুষ্কৃত
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ
জ্ঞানী	অজ্ঞান	সুলভ	দুর্লভ
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দুঃশীল
নশর	অবিনশ্বর	আসল	নকল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক
শাস্তি	অশাস্তি	লায়েক	নালায়েক
শিষ্ট	অশিষ্ট	খুত	নিখুত
শুভ	অশুভ	খোঁজ	নিখোঁজ
শ্রম্ভা	অশ্রম্ভা	বিরত	নিরত
অন্ত	অনন্ত	অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গা
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গাম	আশা	নিরাশা
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অধমর্গ	উচ্চমর্গ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অর্থ	অনর্থ
আচার	অনাচার	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র
আত্মীয়	অনাত্মীয়	প্রবল	দুর্বল
আদর	অনাদর	রোগ	নীরোগ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	সচেষ্ট	নিচেষ্ট
আবিল	অনাবিল	সদয়	নির্দয়
আস্থা	অনাস্থা	সম্বল	নিঃসম্বল
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	সরস	নীরস
ইষ্ট	অনিষ্ট	সাকার	নিরাকার
উপস্থিত	অনুপস্থিত		

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
পথ	বিপথ	অনুরঙ্গ	বিরঙ্গ
বাদী	বিবাদী	অনুরাগ	বিরাগ
যুক্ত	বিযুক্ত	তিরস্কার	পুরস্কার
সফল	বিফল	উচ্চ	নিচ
সুশ্রী	বিশ্রী	উথান	পতন
স্মৃতি	বিস্মৃতি	উদয়	অস্ত
ঠিক	বেঠিক	উন্নতি	অবনতি
তাল	বেতাল	উর্ধ্ব	অধ
হল	বেহাল	এলোমেলো	গোছানো
ঙুশ	বেঙুশ	ওঠা	নামা
অংগ	পশ্চাত	ওস্তাদ	সাগরেদ
অচল	সচল	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
অনুকূল	প্রতিকূল	কোমল	কর্কশ
অন্তর	বাহির	ক্রয়	বিক্রয়
অধম	উত্তম	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
টেস্টাহ	নিরুৎসাহ	খাঁটি	ভেজাল
অল্প	অধিক	খাতক	মহাজন
দোষী	নির্দোষ	খুচরা	পাইকারি
আকুঢ়ন	প্রসারণ	খোলা	বন্ধ
আগে	পিছে	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আগদ	নিরাপদ	গুরু	লঘু
আপন	পর	গৃহী	সন্ধ্যাসী
আদান	প্রদান	গ্রহণ	বর্জন
আদি	অন্ত	ঘাটাতি	বাড়তি
আবির্ভাব	তিরোভাব	ঘাত	প্রতিঘাত
আমদানি	রপ্তানি	চের	সাধু
আয়	ব্যয়	চোখা	তেঁতা

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আসল	নকল	উপকার	অপকার
ইতর	ভদ্র	মান	অপমান
ইদানীং	তদানীং	ইহলোক	পরলোক
লঘু	গুরু	ইহা	উহা
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	মিলন	বিরহ
তেজী	নিম্নেজ		
দাতা	গ্রহীতা	শত্রু	মিত্র
দিন	রাত	শীত্র	বিলম্ব
দীর্ঘ	ক্রম	সত্য	মিথ্যা
দুষ্ট	শিষ্ট	সমষ্টি	ব্যাস্তি
দূর	নিকট	সার্থক	ব্যর্থ
দেওয়া	নেওয়া	সুস্মর	ক্লৃৎসিত
দেনা	পাওনা	সৃষ্টি	ধ্বংস
ধনী	নির্ধন, গরিব	স্থির	চপ্তল
নতুন	পুরাতন	মৃত্তি	বিমৃত্তি
নরম	শক্ত	স্বকীয়	পরকীয়
নিন্দিত	জাহাত	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
নিল্দা	প্রশংসা	স্বর্গ	নরক
বন্ধন	মুক্তি	স্বাধীন	পরাধীন
বন্ধু	শত্রু	হরণ	পূরণ
বর	বৌ	হার	জিত
বর্ধমান	ক্ষীয়মান	হাঙ্কা	ভারি
বড়	ছোট	হাসি	কান্না
বাচাল	স্বল্পভাষী	ত্রাস	বৃদ্ধি
জীবন	মরণ	জোয়ার	তাটা
বেহেশত্	দোজখ	মুখ্য	গৌণ
বোকা	চালাক	টাটকা	বাসি
ব্যর্থ	সার্থক	মৃদু	প্রবল
ভয়	সাহস	ঠকা	জেতা
ভিতর	বাহির	রাজা	প্রজা
ভীতু	সাহসী	ঠাণ্ডা	গরম
ভীরু	নির্ভীক	বুগ্ধ	সুস্থ
ভূত	ভবিষ্যৎ	জাগারিত	নিন্দিত
উক্তর	দক্ষিণ	পূর্ব	পশ্চিম

বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ

- ◆ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে।
- ◆ ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি আছেই।
- ◆ জীবনে হাসি-কান্না পর্যায়ক্রমে আসে।
- ◆ সাগরে জোয়ার-ভাটা পানির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
- ◆ হালকা আর ভারি যন্ত্রগুলো ধোয়ামোছা কর।
- ◆ ‘কোথায় সর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?’
- ◆ এ জগৎ হরণ-পূরণের মেলা।
- ◆ খেলায় হার-জিত থাকবেই।
- ◆ পরাধীন হয়ে সুখতোগের চেয়ে স্বাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করাও ভালো।
- ◆ ছেলেটি বড়ই চঞ্চল, কিন্তু মেয়েটি কেমন ধীরস্থির।
- ◆ সবলের সদস্ত অত্যাচার দুর্বল আর কতদিন সইবে?
- ◆ সাহস দিয়ে ভয়কে জয় কর।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) ‘কার্যে বিরতি’ অর্থে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজ্য?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. হাত করা | গ. হাত গুটান |
| খ. হাত থাকা | ঘ. হাত আসা |

(২) ‘পচন্দ হওয়া’ অর্থে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. গৌঁ ধরা | গ. ম্যাও ধরা |
| খ. মনে ধরা | ঘ. পথ ধরা |

(৩) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বেহায়া’?

- | | |
|-------------------|--------------|
| ক. চিনির বলদ | গ. কান কাটা |
| খ. জিলাপির পঁয়াচ | ঘ. ঠোঁট কাটা |

(৪) ‘সর্বনাশ’ বোঝাতে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজন?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক. ভরাডুবি | গ. পুকুর চুরি |
| খ. বালির বাঁধ | ঘ. মগের মুল্লুক |

(৫) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘সম্মান বাঁচানো’?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. মুখ ছোটা | গ. মুখ রক্ষা |
| খ. মুখ করা | ঘ. মুখ ধরা |

(৬) কেন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বিরাট আয়োজন?’

ক. কপাল ফেরা

গ. আধকপালে

খ. কড়ায় গঠায়

ঘ. এলাহিকান্ত

(৭) ‘এসপার ওসপার’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. এদিক অথবা ওদিক

গ. এই পাড়ে অথবা ওই পাড়ে

খ. মীমাংসা

ঘ. এ রকম অথবা ওই রকম

(৮) ‘গোবর গণেশ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. গোবরের মতো আবর্জনা

গ. চালাক

খ. বোকা

ঘ. মূর্খ

(৯) ‘গোড়ায় গলদ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. বেশি ভুল

গ. শুরুতে ভুল

খ. ভুল জিনিস

ঘ. অল্প ভুল

(১০) ‘গোল্লায় যাওয়া’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. নষ্ট হওয়া

গ. অসৎ কাজ করা

খ. খারাপ কাজে যাওয়া

ঘ. দোষের কাজ করা

২। বাংলা শব্দের ব্যবহারে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলতে কী বোঝায়?

৩। শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক অর্থের যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, তা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

৪। বাগ্ধারা বা বাক্যরীতি বলতে কী বোঝা? ‘মুখ’ অথবা ‘হাত’ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৫। বিশেষ্যস্থানীয় ও বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখিয়ে চারটি করে বাক্য গঠন কর।

৬। নিম্নলিখিত রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশগুলোর অর্থ পাশাপাশি লিখে দাও :

পাকা হাতের লেখা—

|

গায়ে বাতাস লাগা—

মাথা কাটা যাওয়া—

|

গা ঢেলে দেওয়া—

হাত গুটিয়ে বসা—

|

হাত দেওয়া—

হাতে পায়ে ধরা—

|

বুকে লাগা—

(৭) অর্থের পার্থক্য দেখাও

{ গা লাগা

{ নাম কাটা

{ ডাক দেওয়া

{ গায়ে লাগা

{ নামে কাটা

{ ডাকে দেওয়া

{ হাত আসা

{ মন করা

{ মাথা দেওয়া

{ হাতে আসা

{ মনে করা

{ মাথায় দেওয়া।

৮। ডানপাশে শব্দ দেওয়া আছে। তার উপর ভিত্তি করে বাগ্ধারা যোগে বী পাশের শূন্যস্থান পূরণ কর।

- (ক) লোকটার চোখের নেই। (লজ্জা)
- (খ) ভাইয়ের সঙ্গে সমন্ব্য। (ভীষণ গরমিল)
- (গ) এত শোকতাপের পরেও যে বেঁচে আছি তার কারণ আমার তো। (যা সহজে মরে না)
- (ঘ) লোককে বড় কাজের দায়িত্ব দিতে নেই। (অসাধারণ)
- (ঙ) পরের টাকা হাতে পেলেই অনেক করে। (নষ্ট করা)
- (চ) এমন লোক কমই দেখা যায়। (নির্গত্ত্ব)
- (ছ) তোমার কাউকারখানা দেখে আমি তো বনে গেছি। (সম্মিলিত হওয়া)
- (জ) বাইরে ধর্মের কথা বলে বেড়ালেও লোকটা আসলে। (ভদ্র)
- (ঝ) ‘আমি তো তরী করি.....’ (সর্বনাশ)
- (ঝঃ) সমাজপতিরাই হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে। (ক্ষমতাশালী ব্যক্তি)
- (ট) কে যেন আমার কলমটার করেছে। (অপহরণ)

৯। উভয় সারির সামঞ্জস্য বিধান কর।

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (১) হাড় হাতাতে | (১) অযথা শ্রম |
| (২) ভূতের বেগার | (২) একঙ্গুয়ে |
| (৩) বালির বাঁধ | (৩) ক্ষণস্থায়ী |
| (৪) নেই আঁকড়া | (৪) অস্থায়ী বস্তু |
| (৫) তাসের ঘর | (৫) আশায় নৈরাশ্য |
| (৬) গুড়ে বালি | (৬) হতভাগ্য |

১০। নিম্নলিখিত বাগ্ধারাসমূহ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (১) অমাবস্যার টাঁদ | (১) কেঁচো খুঁড়তে সাপ |
| (২) আকাশ কুসুম | (১০) গজলিকা প্রবাহ |
| (৩) আষাঢ়ে গঞ্জ | (১১) তাসের ঘর |
| (৪) গোড়ায় গলদ | (১২) নয় ছয় |
| (৫) টাঁদের হাট | (১৩) বালির বাঁধ |
| (৬) চিনির বলদ | (১৪) রাশভারি |
| (৭) ডুমুরের ফুল | (১৫) ঝুই কাতলা |
| (৮) কলুর বলদ | (১৬) হাতটান |

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাচ্য এবং বাচ্য পরিবর্তন

১. রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলি’ লিখেছেন।
২. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিত হয়েছে।
৩. আমার খাওয়া হলো না।

ওপরের প্রথম বাক্যে কর্তার, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের, তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে।

বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় ‘বাচ্য’।

বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার : (১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য ও (৩) ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার অর্থ-প্রাধান্য রাখিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন— ছাত্ররা অঙ্গ করছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়।

২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যথা— শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান। রোগী পথ্য সেবন করে।

কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন— শিকারি কর্তৃক ব্যাস্ত নিহত হয়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক অনুসর্ণের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়। যথা— আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়। চোরটা ধরা পড়েছে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যথা— আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।

ভাববাচ্য : যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন—

(ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) খাওয়া হলো না।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) এখন যেতে হবে।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(গ) তোমার দ্বারা (কর্তায় তৃতীয়) এ কাজ হবে না।

(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন-

এ পথে চলা যায় না।

এবার ট্রেনে উঠা যাক।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় তৃতীয়া (২) কর্মে প্রথমা বা শুন্য বিভক্তি এবং (৩) ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

জ্ঞাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সেই বাক্যের কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য

(ক) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।

(খ) খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(গ) মুবারক পুস্তক পাঠ করছে।

কর্মবাচ্য

(ক) বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

(খ) বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) মুবারক কর্তৃক পুস্তক পাঠিত হচ্ছে।

শক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং (২) ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন-

কর্তৃবাচ্য

(ক) আমি যাব না।

(খ) তুমিই ঢাকা যাবে।

(গ) তোমরা কখন এলে?

ভাববাচ্য

(ক) আমার যাওয়া হবে না।

(খ) তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।

(গ) তোমাদের কখন আসা হলো?

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শূন্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন-

কর্মবাচ্য

(ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।

কর্তৃবাচ্য

(ক) দস্যুদল গৃহটি সৃষ্টন করেছে।

(খ) হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বস করেন।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে-

(১) কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন-

ভাববাচ্য

(ক) তোমাকে ইঁটতে হবে।

(খ) এবার একটি গান করা হোক।

(গ) তার যেন আসা হয়।

কর্তৃবাচ্য

(ক) তুমি ইঁটবে।

(খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।

(গ) সে যেন আসে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলা হয়। যেমন-

কাজটা ভালো দেখায় না।

ঁাশি বাজে এ মধুর লগনে।

সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।

অনুশীলনী

১। ঠিক উন্নতিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) কর্মবাচ্যে কর্তার কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা

গ. দ্বিতীয়া

খ. তৃতীয়া

ঘ. ষষ্ঠী

(২) ভাববাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. ষষ্ঠী

গ. প্রথমা

খ. দ্বিতীয়া

ঘ. ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া

(৩) কর্তৃবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া

গ. শূন্য

খ. ষষ্ঠী

ঘ. দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য

(৪) কর্মবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা

গ. তৃতীয়া

খ. দ্বিতীয়া

ঘ. কখনো প্রথমা, কখনো দ্বিতীয়া

(৫) দোষী ছাত্রাটিকে জরিমানা করা হয়েছে। – এখানে ‘ছাত্রাটিকে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্তায় দ্বিতীয়া

গ. করণে দ্বিতীয়া

খ. কর্মে দ্বিতীয়া

ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

(৬) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কী হলে কর্মবাচ্য হয় না?

ক. সমাপিকা

গ. সকর্মক

খ. অসমাপিকা

ঘ. অকর্মক

(৭) ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া

খ. প্রথমা

ঘ. ষষ্ঠী

(৮) ‘করিম পুস্তক পাঠ করছে।’ বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে—

ক. পুস্তক করিম কর্তৃক পাঠ হচ্ছে। গ. পুস্তক কর্তৃক করিম পঠিত হচ্ছে।

খ. করিম কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে। ঘ. করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠ করছে।

(৯) তুমি কখন এলে? — বাক্যটিকে ভাববাচ্যে পরিণত করলে কোনটি হবে?

ক. তোমার দ্বারা কখন আসা হলো? গ. তুমি দ্বারা কখন আসা হলো?

খ. তুমি কখন আসা হলো? ঘ. তোমার কখন আসা হলো?

২। ‘বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলা হয়।’ — এ উক্তিটির সমর্থনে বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির উদাহরণ দাও।

৩। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৪। বাক্যে উদাহরণ দাও।

ক) ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হতে পারে।

খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

গ) কর্তৃবাচ্যের তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Participle) — রূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। কর্মকর্তৃবাচ্য বলতে কী বোঝা? উদাহরণযোগে বিশদ আলোচনা কর।

৬। বাচ্যান্তর কর।

(ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে

- ক) আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।
- খ) মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।
- গ) শিকারি বাঘ মেরেছে।
- ঘ) আমি বইটি পড়েছি।

(খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে

- ক) কাফেলা দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হলো।
- খ) স্থপতি ইসা রূমীর তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।
- গ) বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারত রচিত হয়েছিল।
- ঘ) পিতা কর্তৃক পুত্র বিতাড়িত হয়েছে।

৭। কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর।

- ক) আমি একাই যাব।
- খ) এবার একখানা গান হোক।
- গ) আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

৮। বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুন্দর করে লেখ।

- ক) পিতা কর্তৃক আমি একটি কলম দান করা হইয়াছি।
- খ) আজি নিম্নুম রাতে কে বাঁশি বাজে।
- গ) তোমার যাওয়া হটক আমি যাওয়া হবে না।
- ঘ) ছাত্রগণ তোমাদিগ কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শুনা হটক।
- ঙ) শাসন করা তাকেই সাজে, সোহাগ করে যে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উক্তি পরিবর্তন

কোনো কথকের বাক কর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

যে বাকেয় বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা – তিনি বললেন, “বইটা আমার দরকার।”

যে বাকেয় বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপাত্তিরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা : তিনি বললেন যে বইটা তাঁর দরকার।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উদ্ধরণ চিহ্নের (“ ”) অঙ্গৰুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে ‘যে’ এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাকেয়ের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।”

পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

২. বাকেয়ের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, “আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।”

পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাকেয়ের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন	এখন	তখন
এ	সে	গতক্ষণ্য	পূর্বদিন		
আজ	সেদিন	ওখানে	ঐখানে		

৫. অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে।

যেমন- প্রত্যক্ষ উক্তি রহমান বলল, ‘আমি এখনই আসছি’।

পরোক্ষ উক্তি : রহমান বলল যে, সে তখনই যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খন্দ বাকেয়ের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাধিশের ক্রিয়ার কালের উপর নির্ভর করে না।

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলেটি লিখেছিল, “শহরে খুব গরম পড়েছে।”

পরোক্ষ উক্তি : ছেলেটি লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা, ছেলে লিখেছিল শহরে খুব গরম পড়েছে।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তি : মনসুর বলল, “আমি ঢাকা যাব।”

পরোক্ষ উক্তি : মনসুর বলল যে, সে ঢাকা যাবে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্ত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন, “চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।”

পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৭। প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাকের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রশ্নবোধক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “তোমরা কি ছুটি চাও?”

পরোক্ষ উক্তি : আমরা ছুটি চাই কি না, শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, “কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?”

পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে, বাবা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।”

পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, “দয়া করে তেতরে আসুন।”

পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) তেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, “বাঃ! পাখিটি তো চমৎকার।”

পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিখারিনী বলল, “শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : তিখারিনী দুঃখের সাথে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয় দেওয়া হয়েছে। সর্বোন্মতিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) খোকা তোমাকে বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।” এর পরোক্ষ উক্তি হবে-

- ক. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি নেই।
- খ. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।
- গ. খোকা তোমাকে বলল যে তোমার বাবা বাড়ি নেই।
- ঘ. খোকা তোমাকে বলল যে, আমার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

(২) রহমান আমাকে বলল, “আমি এক্সুণি আসছি।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রহমান আমাকে বলল যে আমি এক্সুণি যাচ্ছি
- খ. রহমান আমাকে বলল যে সে এক্সুণি আসছে।
- গ. রহমান আমাকে বলল যে, তুমি তক্সুণি যাচ্ছ।
- ঘ. রহমান আমাকে বলল যে সে তক্সুণি যাচ্ছে।

(৩) হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. হামিদ তাদের পরদিন আসতে বলল।
- খ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন আগামীকাল আসে।
- গ. হামিদ বলল যে তোমরা পরদিন এসো।
- ঘ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন পরদিন আসে।

(৪) করিম তোমাকে বলল, “আমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।” – পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?

- ক. করিম তোমাকে বলল যে সে গতকাল ঢাকা গিয়েছিল।
- খ. করিম তোমাকে বলল যে সে আজ ঢাকা গিয়েছিল।
- গ. করিম তোমাকে বলল যে, তুমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলে।
- ঘ. করিম তোমাকে বলল যে সে আগেরদিন ঢাকা গিয়েছিল।

(৫) রেবা আমাকে বলল, “তাই, তুমি কবে এখানে আসবে?” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রেবা আমাকে ভাই সন্মোধন করে বলল যে আমি কবে এখানে আসব।
- খ. রেবা আমাকে ভাই সন্মোধন করে জানতে চাইল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- গ. রেবা আমাকে ভাই সন্মোধন করে বলল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- ঘ. রেবা আমাকে বলল, তুমি কবে সেখানে আসবে।

- ২। উক্তি বলতে কী বোঝ? উক্তি কয় প্রকার ও কী কী?
- ৩। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিশেষ স্থলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা পাশাপাশি লিখে শূন্যস্থান পূরণ কর।
- (ক) প্রত্যক্ষ উক্তির..... উঠে যায় এবং প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে সংযোজক অব্যয়টি বসাতে হয়।
 - (খ) প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে বাকের..... রক্ষা করে পরিবর্তন করতে হয়।
 - (গ) প্রত্যক্ষ উক্তির স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে..... হয়।
 - (ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান খন্দবাক্যের ক্রিয়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হলে পরোক্ষ উক্তিতে তা.....
..... কালের কিম্বা..... কালেরও হতে পারে।
- ৪। সংক্ষেপে জবাব দাও : প্রত্যক্ষ উক্তির কোন কোন স্থলে পরোক্ষ উক্তিতে কোনো পরিবর্তন হয় না?
- ৫। নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন কর।
- (ক) সে বলল, “তা কি হয়? তোমাকে এখন যেতে দিচ্ছে কে? দয়া করে আমার সঙ্গে চল।”
 - (খ) সেনাপতি বললেন, “মহারাজ আমরা থাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দি করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যেতে অনুমতি দিন।”
 - (গ) শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।”
 - (ঘ) মা বললেন, “সুমন, দেরি না করে চলে এসো। পড়তে বসো। মন দিয়ে পড়ো। কাল তোমার পরীক্ষা মনে নেই?”
 - (ঙ) নিম্নুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, “পাখি মরিয়াছে।” ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, কী কথা শুনি।” ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পূরা হইয়াছে।” রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর লাফায়?” ভাগিনা বলিল, “আরে রাম।” “আর কি উড়ে?” “না।” “দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?” “না।” রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আন দেখি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতি বা ছেদচিহ্নের শিখন কৌশল

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হৰ্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদচিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো:

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)		এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঞ্চ
বিশ্বায় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	ঞ্চ
কোলন	:	ঞ্চ
ড্যাস	-	ঞ্চ
কোলন ড্যাস	:-	ঞ্চ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	,	থামার প্রয়োজন নেই।
উন্দ্ররণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বন্ধনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[]	থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}

- ক) বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন— সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

- খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন— সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।
- গ) সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন— রশিদ, এদিকে এসো।
- ঘ) জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন— কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।
- ঙ) উন্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন— সাহেব বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
- চ) মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর ‘কমা’ বসবে। যেমন— ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ সন।
- ছ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন— ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।
- জ) নামের পরে ডিপ্রিসুচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমন— ডষ্টর মুহুম্বদ এনামুল হক, এম.এ. পি-এইচ.ডি।

২. সেমিকোলন (;)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। যথা— সংসারের মায়াজালে আবন্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্চেদ্য?

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচেদ (!)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচেদ ব্যবহার করতে হয়। যথা— শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন— তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

৫. বিঅয় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এ সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন—

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।

জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।

৬. কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সভায় সাব্যস্ত হলো : একমাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৭. ড্যাস চিহ্ন (-)

যৌগিক ও মিশ্র বাকেয় পৃথক তাবাগন্ন দুই বা তার বেশি বাকেয়ের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর— এতে তোমাদের সম্মান যাবে না—বাড়বে।

৮. কোলন ড্যাস (:-)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন—পদ পাঁচ প্রকারঃ—

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৯. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন— এ আমাদের শুন্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

১০. ইলেক (') বা লোগ চিহ্ন

কোনো বর্ণ বিশেষের লোগ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য (') লোগচিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—

মাথার ‘পরে ঝলছে রবি (‘পরে=ওপরে)

পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা=কাহারা)

১১. উন্দ্ররণ চিহ্ন (“ ”)

বঙ্গার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অনুরূপ করতে হয়। যথা—শিক্ষক বললেন, “গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে।”

১২. ব্র্যাকেট বা বৰ্ধনী চিহ্ন (), { }, []

এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বৰ্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন— ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

(ক) ধাতু বোঝাতে (✓) চিহ্ন : √স্থা =স্থা ধাতু।

(খ) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন: জাঁদরেল < জেনারেল।

(গ) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন: গঞ্জা > গাঙ।

(ঘ) সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উভয়ের মধ্যে সর্বোন্নমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) বাক্যে কমা (,) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. $\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

গ. এক সেকেন্ড

খ. $\frac{3}{8}$ সেকেন্ড

ঘ. এক বলতে যে সময় লাগে

(ii) বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ বলতে যে সময় লাগে

গ. ১ সেকেন্ড

খ. ১ বলার দ্বিগুণ সময়

ঘ. ২ সেকেন্ড

(iii) বাক্যের শেষে দাঁড়ির পর কতক্ষণ খেমে পরের বাক্য পড়তে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড

গ. ২ সেকেন্ড

খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

ঘ. সেকেন্ড

(iv) হাইফেন (-) এরপর কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড

গ. ২ সেকেন্ড

খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড

ঘ. থামার প্রয়োজন নেই।

(v) সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

ক. সেমিকোলন

গ. দাঁড়ি

খ. কমা

ঘ. কোনো চিহ্নই নয়

(vi) ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. <

গ. ✓

খ. -

ঘ. >

(vii) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. >

গ. ✓

খ. <

ঘ. :

(viii) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. ✓

গ. >

খ. :

ঘ. <

- ২। যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বলতে কী বোঝা? বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের আবশ্যিকতা কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ৩। আমরা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কী কী ছেদচিহ্নের ব্যবহার করে থাকি? প্রত্যেকটি চিহ্নের নাম, রূপ এবং তজ্জনিত বিভাগের কাল-পরিমাণ নির্দেশ কর।
- ৪। স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার দেখাও :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (ক) বিময় চিহ্ন ও সম্মোধন চিহ্ন | (গ) ড্যাস চিহ্ন ও হাইফেন চিহ্ন |
| (খ) উন্ধরণ চিহ্ন ও লোপ চিহ্ন | (ঘ) ধাতুর চিহ্ন ও সমানবাচক চিহ্ন। |
- ৫। সংক্ষেপে জবাব দাও :
- (ক) কোলন ও কোলন-ড্যাস চিহ্ন ব্যবহারের পার্থক্য কী?
 - (খ) সম্দেহ বা ব্যঙ্গ বোঝাতে তুমি কোন প্রকারের যতিচিহ্নের ব্যবহার করবে?
 - (গ) কোন কোন ক্ষেত্রে কমা চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়?

৬। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে যতিচিহ্ন বসিয়ে আবার লেখ।

প্রভাত হলো সোহরাব ময়দানে এসে হাঁকলেন ইরানশাহ কায়কাউস আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি ইরান শাহ চুপ কেন উন্নত তবে কি ইরানী ফৌজে এমন পাহলোয়ান নেই যে আমার সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

স্বরভঙ্গি ও বাগ্ভঙ্গি

১. অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগে বাংলাদেশে বিজয় সিংহ নামে খুব সাহসী এক রাজপুত্র ছিলেন।
২. প্রকৃতি কী সুন্দর সাজেই না সেজেছে!
৩. তাঙ্গব ব্যাপার।
৪. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
৫. ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।’
৬. ‘দীর্ঘজীবী হও।’
৭. ‘সবারে বাস রে ভালো।’
৮. উঠে বস।

ওপরের প্রথম বাক্যটি বিবৃতিমূলক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দুটি বিঅয়সূচক; চতুর্থ বাক্যটি প্রশ্নসূচক; পঞ্চম বাক্যটি প্রার্থনামূলক; ষষ্ঠ বাক্যটি আশীর্বাদবোধক; সপ্তম বাক্যটি অনুরোধমূলক; অষ্টম বাক্যটি আদেশসূচক।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আবেগ-উচ্ছ্঵াস, অনুরোধ-প্রার্থনা, আদেশ-মিনতি, শাসন-তিরস্কার কর্তৃস্বরের নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ জ্ঞান দিয়ে কথা বলা, কর্তৃস্বরের উঠা-নামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্তৃধ্বনি উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ভাব ও অর্থ সৃষ্টি করে। এই ধ্বনি-তরঙ্গ বা স্বরভঙ্গাকে স্বরভঙ্গি বলে। এই স্বরভঙ্গাই বাগ্ভঙ্গির ভিত্তি।

স্বরভঙ্গির দ্বারা যে শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি ও উচ্চারিত হয়, তাকে শিথিত আকারে এবং উচ্চারিত অবস্থায় বাগ্ভঙ্গি বলা যেতে পারে।

বাক্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে।

১. **বিবৃতিমূলক বাক্য (Assertive sentence) :** সাধারণভাবে হ্যাঁ বা না বাচক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার হতে পারে : হ্যাঁবাচক বাক্য (Affirmative sentence) এবং না বাচক বাক্য (Negative sentence)।

উদাহরণ—**হ্যাঁ বাচক বাক্য :** সে ঢাকা যাবে। আমি বলতে চাই।

না বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে না। আমি বলতে চাই না।

২. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative sentence) : এ ধরনের বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যথা :
কোথায় যাচ্ছ? কী পড়ছ? কেন এসেছ? যাবে নাকি?

৩. বিম্বয়সূচক বাক্য (Exclamatory sentence) : যে বাক্যে আশ্র্যজনক কিছু বোঝায় তাকে বিম্বয়সূচক বাক্য বলে। যথা :

তাজ্জব ব্যাপার! সমুদ্রের সে কী ভীষণ গর্জন, টেঙ্গুলো পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু— আমি তো ভয়ে মরি! হুররে, আমরা জিতেছি!

৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য (Optative sentence) : এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা :

তোমার মঞ্জল হোক। ঈশ্বর তোমাকে জয়ী করুন। পরীক্ষায় সফল হও। দীর্ঘজীবী হও।

৫. আদেশ বাচক বাক্য (Imperative sentence) : এ ধরনের বাক্যে আদেশ করা হয়। যথা :

শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিকক্ষে এলে উঠে দাঁড়াবে। চুপটি করে বস। উঠে দাঁড়াও। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।

স্বরভঙ্গি তথা বাগ্ভঙ্গির সাহায্যে ক্রোধ, আদর, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, বিম্বয়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। যথা :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| ১. সাধারণ বিবৃতিতে | : | সে আজ যাবে। |
| ২. জিজ্ঞাসায় | : | সে আজ যাবে? |
| ৩. বিম্বয় প্রকাশে | : | সে আজ যাবে! |
| ৪. ক্রোধ প্রকাশে | : | আমি তোমাকে দেখে নেব। |
| ৫. আদর বোঝাতে | : | বড় শুকিয়ে গেছিস রে। |
| ৬. আনন্দ প্রকাশে | : | বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে! |
| ৭. দুঃখ প্রকাশে | : | আহা, গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গেছে! |
| ৮. বিরক্তি প্রকাশে | : | আঃ, ভালো লাগছে না, এখন এখান থেকে যাও তো। |
| ৯. ভীতি প্রদর্শনে | : | যাবি কি না বল? |
| ১০. লজ্জা প্রকাশে | : | ছিঃ ছিঃ, তার সঙ্গে পারলে না। |
| ১১. ধিক্কার দিতে | : | ছিঃ, তোমার এই কাজ। |
| ১২. ঘৃণা প্রকাশে | : | তুমি এত নীচ! |
| ১৩. অনুরোধ প্রকাশে | : | কাজটি করে দাও না ভাই। |
| ১৪. প্রার্থনা | : | ঈশ্বর তোমার মঞ্জল করুন। |

ছেদ ও বিরতিসূচক চিহ্নগুলো বাগ্ভঙ্গির লিখিত আকার প্রকাশে সাহায্য করে। দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিম্বয়সূচক চিহ্ন বাক্যের ভাব ও অর্থবোধের জন্য উপকারক।

অনুশীলনী

১। চারটি উভয়ের সর্বোত্তমটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(১) কোনটি আদেশসূচক বাক্য ?

ক. তোমাকে বসতে বলেছি।

গ. তুমি কি বসবে ?

খ. এখানে এস।

ঘ. বসলে খুশি হব

(২) “সে কি যাবে” – এটি কী ধরনের বাক্য ?

ক. আদেশসূচক

গ. বিবৃতিমূলক

খ. বিশ্বায়সূচক

ঘ. প্রশ্নসূচক

(৩) “আমি তোমাকে মেহ করি।” এটি কী ধরনের বাক্য ?

ক. প্রশ্নসূচক

গ. বিশ্বায়সূচক

খ. বিবৃতিমূলক

ঘ. আদেশমূলক ?

(৪) কোনটি প্রশ্নসূচক বাক্য ?

ক. কী খেলাই খেললে

গ. আমি খেলব না

খ. তুমি অবশ্যই খেলবে

ঘ. তুমি কি খেলেছ

(৫) “তোমাকে আজই যেতে হবে।” এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. বিশ্বায়সূচক

গ. আদেশসূচক

খ. প্রার্থনামূলক

ঘ. বিবৃতিমূলক

(৬) “কী সাংঘাতিক ব্যাপার।” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. বিবৃতিমূলক

গ. প্রশ্নমূলক

খ. বিশ্বায়সূচক

ঘ. অনুরোধবাচক

(৭) “কোথায় যাচ্ছ ?” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. বিশ্বায়সূচক

গ. প্রশ্নমূলক

খ. বিবৃতিমূলক

ঘ. অনুরোধমূলক

(৮) “এখানে এসো।”- এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. অনুরোধজ্ঞাপক

গ. বিবৃতিমূলক

খ. আদেশমূলক

ঘ. বিশ্লেষণসূচক

(৯) বাগ্ভঙ্গি কী ?

ক. শব্দভঙ্গি

গ. নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ

খ. বাক্যভঙ্গি

ঘ. মুখভঙ্গি

(১০) কোনটি বিশ্লেষণসূচক বাক্য ?

ক. কী করবে ?

গ. সকলের মঙ্গল হোক।

খ. জয়ী হও।

ঘ. কী সুন্দর ফুল!

২। স্বরভঙ্গি কাকে বলে ?

৩। বাগ্ভঙ্গি বলতে কী বোঝ ?

৪। বাগ্ভঙ্গি অনুযায়ী কয় প্রকার বাক্য গঠন সম্ভব ?

৫। বাগ্ভঙ্গির সাহায্যে কী কী ধরনের বাক্য গঠন করা যায় ?

৬। আদেশসূচক বাক্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

৭। বিশ্লেষণসূচক বাক্য বলতে কী বোঝ ? এ ধরনের দুটি বাক্যের উদাহরণ দাও।

৮। বিবৃতিমূলক বাক্য কাকে বলে ? এ ধরনের বাক্য কয় প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৯। প্রার্থনামূলক বাক্য কাকে বলে উদাহরণসহ লেখ।

১০। ক্রোধ প্রকাশক এবং আনন্দবাচক বাক্যের উদাহরণ দাও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম (Syntax)

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ সংস্থাপনার ক্রম। একে কেউ কেউ পদক্রম বলে থাকেন।

নিয়মাবলি

১. সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন –

মনোযোগী	ছাত্ররাই	বীতিমত	পড়াশোনা করে।
(সম্প্রসারক)	কর্তৃপদ	(সম্প্রসারক)	(ক্রিয়াপদ)

কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন –

লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।

২. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে। যেমন –“ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।”

অর্থ সংজ্ঞার রক্ষার জন্য বা ছন্দের অনুরোধে সম্বন্ধ পদ পরেও বসতে পারে। যেমন –

“হে আদি জননী সিংহু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।”

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন –

লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।

৪. বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসে। যথা : লোকটি যে জানী তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন – আমি ‘শাহনামা’ পড়েছি।

(ক) কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – ‘লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।’

(খ) বাক্যে জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – জানি, তোমার মুরোদ কতটুকু।

৬. বহুপদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যেমন – তোমার দাঁত বের-করা হাসি দেখলে সবাই পিণ্ড জ্বলে যায়।

বাক্যে ‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের ব্যবহার

(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা – আমি যাব না। আমি ভাত খাই নে, ঝুঁটি খাই।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা – না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।

- (গ) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন – না ভালো, না মন্দ।
 (ঘ) ‘যদি’ দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে ‘না’ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। মেয়ন : তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে খুবই ক্ষতি হবে।

‘না’ (নঞ্চ ব্যতীত) অন্য অর্থে

- ক. বিকল্পার্থে : জিঞ্জাসাবাচক বাকেয় – তুমি বাড়ি যাবে, না আমি যাব?
 খ. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে (নির্রক্ষকভাবে বাকেয়ের শেষে) : একটা গান গাও না ভাই।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

(i) বাকেয় সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|----------------------|
| ক. প্রথমে | গ. উদ্দেশ্যের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. অব্যয় পদের পর |

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাকেয়ের কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষণের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষ্যের পর |

(iii) বাকেয় বিধেয়-বিশেষণ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষণের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষ্যের পর |

(iv) বাকেয় বহুপদময় বিশেষণ কোথায় বসে?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ক. প্রথমে | গ. সর্বনামের পূর্বে |
| খ. বিশেষ্যের পূর্বে | ঘ. শেষে |

(v) ‘না’ শব্দটি বাকেয়ের কোথায় বসে?

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে | গ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে |
| খ. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে | ঘ. বিশেষণের পরে |

(vi) বাকেয় কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|---------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষ্যের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষণের আগে |

(vii) সম্বন্ধ পদ বাকেয় কোথায় বসে?

- | | |
|---------------------|------------------|
| ক. বিশেষ্যের পূর্বে | গ. বিশেষ্যের পরে |
| খ. বিশেষণের পূর্বে | ঘ. বিশেষণের পরে। |

২। বাকেয় পদ সংস্থাপনের ক্রম বলতে কী বোঝ? এর উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৩। বাকেয় পদ সংস্থাপনের ক্রম বিষয়ে পাঁচটি নিয়ম আলোচনা কর।

৪। ‘না’ অব্যয়টি যদি নওঃ ব্যতীত অন্য অর্থে বাকেয় প্রযুক্ত হয়, তবে সেটি কী কী অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে?
উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। বাকেয় উদাহরণ দাও :

- (ক) বাকেয় জোর দিতে গেলে ক্রিয়াপদ বাকেয়ের প্রথমেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- খ) স্থান ও কালের অর্থ বিশদভাবে বোঝানোই অধিকরণ কারকের উদ্দেশ্য, কাজেই বাকেয় অধিকরণ কারকের অবস্থানে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

২০১৮
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ ব্যাকরণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য